Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# ঈমান সবার আগে


**তত্ত্বাবধায়নেঃ**

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

**জমা দিয়েছেনঃ**

এস এম কামরুল আহসান

রোলঃ 227011111


৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ঈমান সবার আগে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

এস এম কামরুল আহসান

রোলঃ 227011111

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ঈমান সবার আগে " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে এস এম কামরুল আহসান, আইডিঃ 227011111 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ঈমান সবার আগে " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

**এস এম কামরুল আহসান**

আইডিঃ 227011111

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

## সূচিপত্র


ভূমিকা ....................................................................................................................5

ঈমান .....................................................................................................................6

ঈমানের আভিধানিক অর্থ ..................................................................................7

ঈমানের পারিভাষিক অর্থ .................................................................................7

বিভিন্ন ফিরকার দৃষ্টিতে ঈমান ............................................................................8

জাহমিয়াহ ও মুরজিয়াদের দৃষ্টিতে ঈমান ............................................................8

কাররামিয়াহদের দৃষ্টিতে ঈমান .......................................................................... 10

খারেজী ও মুতাযিলাদের বিচ্যুতি ...................................................................... 12

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব ...................................................... 13

ঈমান ও আমলের সম্পর্ক ................................................................................. 13

ঈমানের গুরুত্ব ও ফযিলত ................................................................................. 14

ঈমান ও এর অপরিহার্য অনুষঙ্গ ......................................................................... 21

ঈমানের রুকনসমূহ ......................................................................................... 31

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যে আকীদাসমূহ রাখা আবশ্যক ..................................... 33

আল্লাহ তা’আলা কে যে আকীদাসমূহ থেকে চিরপবিত্র মনে করা আবশ্যক ..................... 35

আল্লাহ তা’আলার নাম ও সিফাত সম্পর্কিত আকীদা ........................................... 37

শিরক ............................................................................................................. 40

ঈমান বিল কুরআন ......................................................................................... 48

ইসমাতুল আম্বিয়া ............................................................................................ 51

খতমে নবুয়াত ................................................................................................. 52

তাকদীর দুই প্রকার ........ 58
উপকরণ গ্রহণ তাকদীর বিশ্বাস পরিপন্থী নয় ........ 58
কুফর ........ 59
নাওয়াকিদুল ঈমান বা ঈমান ভঙ্গের কারণ ........ 60
ঈমান ভঙ্গ হয় বা কুফল প্রকাশ প্রায় তিন মাধ্যমে ........ 60
ঈমান ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ ........ 60

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি দ্বীনকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, আমাদের উপর তার নিয়ামত সম্পূর্ণ করেছেন এবং ইসলামকে আমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। আর আমাদের জাতি অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে সর্বোত্তম জাতিতে পরিণত করেছেন।

সালাত ও সালাম পেশ করছি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যাকে আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বজাহানের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন, আরও পেশ করছি তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপর যাদের হাজারো ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা আজ ইসলাম পেয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হচ্ছে ঈমান। ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। মুসলমানদের জীবনের সর্বপ্রথম এবং প্রধান শর্ত হলো ঈমান। কোনো নেক আমল বা ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া বান্দার কোন নেক আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

একজন মুসলিমের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে ঈমান। ঈমান একজন মুসলিমের কাছে নিজের প্রাণের চেয়েও দামী। একজন ঈমানদার শত অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করতে পারে, এমনকি মৃত্যুকেও হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে কিন্তু ঈমান ছাড়তে পারে না। ঈমান শুধু মুখে কালিমা পড়ার নাম নয়, ইসলামকে সকল অপরিহার্য অনুষঙ্গসহ মনে-প্রাণে কবুল করার নাম। তাই একজন মুমিন কখনো শৈথিল্যবাদী হতে পারে না। মুমিনকে হতে হবে ঈমানের ব্যাপারে সুদৃঢ়, অটল এবং প্রত্যয়ী।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। (সুরাহ ইউসুফ, আয়াত - ১০৬)

এই আয়াতটি বর্তমান অবস্থার সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম মনে করে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা, ইসলামী নাম রাখা, মুখে কালিমা পড়ার দ্বারাই মুসলিম হওয়া যায়, যদিও তার চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ, জীবন-যাপনপদ্ধতি যাই হোক না কেন। সে জানে না মুসলিম হতে হলে সকল ধরনের শিরক ও কুফর থেকে দূরে থাকতে হয়। ফলে সে একদিকে নিজেকে মুসলিম দাবী করছে অপরকে ঈমানবিরোধী বিভিন্ন কর্ম-কান্ডে লিপ্ত হচ্ছে। মুসলিম হওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামের উপর ঈমান আনা শর্ত। কিন্তু কাফির হওয়ার জন্য শরীয়তের যেকোনো একটি স্পষ্ট বিষয় অস্বীকার করাই যথেষ্ট। এজন্য কুরআনে আল্লাহ বলেছেন অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনার পরেও শিরকী কাজে লিপ্ত হয়ে মুশরিকে পরিণত হয়।

তাই আমাদের জানতে হবে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, ঈমানের অপরিহার্য রোকনসমূহ কি কি, ঈমানের শর্ত ও দাবী কি, কি কি কারণে ঈমান ভঙ্গ হয়ে মানুষ মুশরিক এবং কাফিরে পরিণত হয়। কারণ দ্বীন এবং ঈমান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কিংবা জ্ঞান থাকলেও বেপরোয়া মানসিকতার কারণে মানুষ ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

তাই 'ঈমান সবার আগে' বিষয়টি ইসলামের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

## ঈমান

বিশ্বাস বা ধর্ম-বিশ্বাস বুঝাতে মুসলিম সমাজে সাধারণত 'ঈমান' ও 'আকীদা' এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে সর্বদা 'ঈমান শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই যে, হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে ধর্ম-বিশ্বাস বুঝাতে আরো কিছু পরিভাষা পরিচিতি লাভ করে। ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য বিজিত দেশের অনেক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আগমন করেন। এ সকল মানুষ নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে এবং তাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়ে নানা বিতর্কের সূত্রপাত করেন। এদের বিতর্কের বিষয়ে ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন তাবিয়ীগণ এবং পরবর্তী যুগের ইমামগণ। তারা ধর্ম-বিশ্বাসের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্য ঈমান ছাড়াও অন্যান্য পরিভাষা ব্যবহার করেন। এ সকল পরিভাষার মধ্যে রয়েছে 'আল-ফিকহুল আকবার', 'ইলমুত তাওহীদ', 'আস-সুন্নাহ', 'আশ-শরীয়াহ', 'আল-আকীদাহ' ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে 'আকীদাহ'

পরিভাষাটি সবচেয়ে পরে চালু হলেও সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পরে আকীদা শব্দের ব্যবহারের ব্যাপকতা লাভ করে।

## ঈমানের আভিধানিক অর্থ

আরবি ‘আমন’ শব্দ থেকে ঈমান শব্দটির উৎপত্তি। আমন (أمن) অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বস্ততা, হৃদয়ের স্থিতি ইত্যাদি। ঈমানের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নিরাপত্তা দেওয়া, আশংকা মুক্ত করা। এর বিপরীত হচ্ছে ভয়-ভীতি। রাগেব আল-ইসফাহানী বলেন, ঈমানের মূল অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি এবং ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাওয়া। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন - ঈমানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আত্মার প্রশান্তি। আর সেটা অর্জিত হবে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ও আমলের মাধ্যমে।

## ঈমানের পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিক অর্থে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট ঈমান হলো মূল ও শাখাসহ হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। প্রথম দুইটি মূল আর শেষেরটি হলো শাখা, যেটা না থাকলে পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না।

ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন - ‘ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন এবং হৃদয় দ্বারা চেনা’। পরিভাষায় ঈমান হলো, আল্লাহর একত্ববাদ এবং নবী-রসুলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে দৃঢ়ভাবে জানা, সত্যায়ন করা, স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেগুলোর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।

আল-ফিকহুল আকবারে এসেছে - ‘ঈমান হলো এই মৌখিক স্বীকারোক্তি দেওয়া যে আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাগণের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর, তার রসুলগণের উপর, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদিরের ভালোমন্দের উপর, পরকালের হিসাব-নিকাশ, মিযান (দাঁড়িপাল্লা) এবং জান্নাত-জাহান্নামের উপর। আমি বিশ্বাস করি এগুলো সব সত্য।

আল-ফিকহুল আবসাতে এসেছে - ‘ঈমান হলো ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তার কোন শরীক নেই, এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া। আর আল্লাহর ফেরেশতা, তার নাযিলকৃত কিতাব,

তার প্রেরিত রসুল, তার জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত এবং তাকদীরের ভালো-মন্দে সাক্ষ্য দেওয়া।’

ইমাম তহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন - ইমান হলো মুখে স্বীকার করা, অন্তরে সত্যয়ন করা। পরিভাষায় ঈমান বলা হয় - আল্লাহ, তার ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, রসুল, আখিরাত, তাকদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা।

ঈমানের এই সংজ্ঞায়ন ও রোকনগুলো কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। কারও ব্যক্তিগত ইজতিহাদ ও জ্ঞান-গবেষণার ফলাফল নয়। কারণ ঈমান হলো সবকিছুর মূল ভিত্তি।

## বিভিন্ন ফিরকার দৃষ্টিতে ঈমান

ঈমান অর্থ হলো মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের সত্যায়ন। তবে ঈমানের হাকীকত কি কিংবা এটি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সেটা নিয়ে বড় ধরনের ইখতেলাফ এবং দীর্ঘ বিতর্ক রয়েছে। বড় বিতর্ক রয়েছে আহলে সুন্নাত এবং আহলে বিদআতের মাঝে। কিছু মতভিন্নতা আছে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারার মাঝেও। আবার খোদ ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এবং পরবর্তী হানাফী উলামায়ে কেরামের মাঝেও কিছুটা মতভেদ রয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন ফিরকার দৃষ্টিতে ঈমান এবং আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে ঈমানের সংজ্ঞায়ন নিয়ে আলোচনা করা হলোঃ

## জাহমিয়াহ ও মুরজিয়াদের দৃষ্টিতে ঈমান

ভ্রান্ত জাহমিয়াহদের মতে ঈমান হলো - আল্লাহ তা'আলা, রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যাকিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলো স্রেফ জানা। জানার বাইরে মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন ও আত্মসমর্পণ, আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান, ভয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল - এগুলোর কোনকিছুই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে কুফর হলো স্রেফ আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা! ফলে কোন ব্যক্তির যদি জানা থাকে যে, আল্লাহ একজন আছেন, এরপর মুখে তাকে অস্বীকার করে, তবুও সে কাফের নয়। চরমপন্থি মুরজিয়াদের মতে, ঈমান হলো স্রেফ আল্লাহকে জানা, কুফর হলো তাকে না জানা। ফলে কেউ যদি তিন ইলাহতে বিশ্বাস করে তবুও সে কাফের হবে না। তবে এটুকু যে, কাফের ছাড়া কেউ

এ কথা বলে না। তাদের মতে, আল্লাহকে জানাই যথেষ্ট। এটাই তাকে ভালোবাসা, তার প্রতি আত্মসমর্পণ করা। তাদের মতে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাই ইবাদত, ফলে নামাজ-রোজা কোন ইবাদত নয়।

জাহমিয়াহ ও মুরজিয়াদের উক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জগতে কাফের খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ এই মূলনীতি অনুযায়ী ইবলিস, ফিরআউন, আবু জাহল, লাহাব সবাই মুমিন হয়ে যায়। জগতের সকল ধর্মে বিশ্বাসী লোকজন কোনো না কোনোরূপে আল্লাহ কিংবা একজন স্রষ্টার কথা জানে। ফলে সবাই মুমিন হয়ে পড়ে! এগুলো সব কুফরি কথা। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন - শুধু অন্তরের জানার নামই ঈমান নয়। এমন হলে আহলে কিতাব তথা ইহুদী, খৃষ্টান সবাই মুমিন বলে গণ্য হতো। কারণ আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন -

**اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ**

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সে রকমই চিনে, যেমন চিনে নিজের সন্তানদেরকে - সুরাহ বাকারাহ, আয়াত - ১৪৬

আহলে কিতাবীরা রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের সন্তানের মতোই চিনতো তবুও তারা মুমিন নয়। কারণ তারা জানলেও স্বীকৃতি দেয়নি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

**وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا**

তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। সুরাহ নামল, আয়াত - ১৪

সত্য জেনেও তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিলো ফলে তারা মুমিন নয়। কারণ ঈমান স্রেফ জানা নয়, বরং গভীর বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ।

# কাররামিয়াহদের দৃষ্টিতে ঈমান

তাদের দৃষ্টিতে ঈমান হলো স্রেফ মুখের স্বীকৃতি। অন্তরের সত্যায়ন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, আমলও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বানী -

**قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ**

তোমরা বল, ‘আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা ইবরাহীম ও ইসমা‘ঈল এবং ইসহাক ও ইয়াকূব ও বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা মূসা ও ‘ঈসাকে দেয়া হয়েছে আর যা অন্যান্য নাবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে (এ সবের প্রতিও ঈমান এনেছি), আমরা এদের মধ্য হতে কোন একজনের ব্যাপারেও কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পিত’। সুরাহ বাকারাহ, আয়াত - **১৩৬**

আল্লাহর বানী -

**وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَي الرَّسُوْلِ تَرٰٓي اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ**

রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয় তারা যখন তা শুনে, তুমি দেখবে, সত্যকে চিনতে পারার কারণে তখন তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই তুমি আমাদেরকে সাক্ষীদাতাদের অন্তর্ভুক্ত কর। সুরাহ মায়িদা, আয়াত - ৮৩।

তাদের বক্তব্য হলো - এসকল আয়াতে স্রেফ বলা তথা মুখের স্বীকৃতিকে ঈমান বলা হয়েছে। এটা অত্যন্ত জঘন্য এবং ভ্রান্ত আকীদা। কারণ এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মুনাফিকও মুমিন বলে গণ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন - শুধু মুখের স্বীকৃতি ঈমান নয়। এমন হলে মুনাফিকরা সবাই মুমিন বলে গণ্য হতো। অথচ তারা মুখে স্বীকৃতি দিলেও অন্তরে বিশ্বাস করে না। তাই তারা মুমিন নয়। মুখের স্বীকৃতি থাকার পরও মুনাফিকদের আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকার ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

ۚ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে, তুমি তাদের জন্য কক্ষনো কোন সাহায্যকারী পাবে না।

মুনাফিকরা কাফির। তাদেরকে কখনোই ক্ষমা না করার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর (উভয়ই সমান), তুমি তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ কক্ষনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফুরী করেছে। আর আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। সুরাহ তাওবা, আয়াত ৮০।

পাশাপাশি কুরআনের সেসব আয়াতও কাররামিয়াহদের ভ্রান্ত মাযহাবের খন্ডন যেখানে অন্তরকে ঈমানের আধার বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ

হে রসূল! কুফরীর ব্যাপারে তাদের প্রতিযোগিতা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়, যারা মুখে বলে ঈমান এনেছি কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি। সুরাহ মায়িদাহ, আয়াত ৪১।

আরও এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা মুখের স্বীকৃতিকে ঈমান বলা নাকচ করে দিয়ে বলেন -

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ

মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছি" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। সুরাহ বাকারাহ, আয়াত ৮।
এখানে উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে শুধু মুখের স্বীকৃতিকে অগ্রহণযোগ্য এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বরং মুখের স্বীকৃতির সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস এবং বাস্তবতা না থাকে তাহলে মুনাফিক বলে গণ্য হবে।

# খারেজী ও মুতাযিলাদের বিচ্যুতি

সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাতের মাযহাব মতে, ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল এই তিনের সমন্বয়। মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস হচ্ছে মূল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল শাখাগত অংশ। ফলে আমলের কমতি হলেও ঈমান নষ্ট হয় না। কিন্তু খারেজীরা সবগুলোকে একটি একক মনে করে। ফলে সামান্য নষ্ট হলে পুরোটাই নষ্ট গণ্য করে। সেজন্য তাদের কাছে ঈমানের আরেকটি শর্ত হলো - সকল প্রকার কবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকা। কবীরাহ গুনাহ করার অর্থ হলো আমলের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি আসা। আমল যেহেতু ঈমানের অঙ্গ এবং খারেজীদের কাছে ঈমান একটি একক, ফলে তাদের কাছে কবীরাহ গুনাহকারী ব্যক্তি কাফির। এই ভ্রান্ত মতবাদের উপর ভিত্তি করেই তারা আলী এবং মুয়াবিয়া রদ্বিআল্লাহু আনহুমাসহ অসংখ্য সাহাবীদেরকে কাফির বলেছে, হত্যা করেছে। যুগে যুগে তাদের অনুসারীরা আহলে সুন্নাতের মুসলিমদের উপর অস্ত্রধারণ করেছে, রক্তপাত করেছে, আজও করছে।

খারেজীদের মতো মুতাযিলারা কবীরাহ গুনাহকারীকে কাফির না বললেও ইহকালের ব্যাপারে ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি রাখে। মুমিন হিসেবে স্বীকার করে না। পরকালের ব্যাপারে খারেজীদের মতোই চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে।

তাদের বক্তব্যের দলিল হিসেবে তারা বলে - আল্লাহ তা'আলার বাণী -

**وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا**

তারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না। আর যথার্থতা ব্যতীত কোন প্রাণ হত্যা করে না যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন আর তারা ব্যভিচার করে না। আর যে এগুলো করে সে শাস্তির সাক্ষাৎ লাভ করবে।

**يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا**

ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে আর সে সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। সুরাহ ফুরকান, আয়াত ৬৮-৬৯।

তাদের মতে, এখানে শিরকের ফলাফল যেমন চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলা হয়েছে, কবীরাহ গুনাহের ফলও জাহান্নামী বলা হয়েছে। সুতরাং কবীরাহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ঈমানের অংশ। কবীরাহ গুনাহ ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়।

এইটা তাদের ভ্রান্ত আকীদা। এখানে কবীরাহ গুনাহের শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম নয় বরং দীর্ঘ সময় বুঝানো হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য আয়াত থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

## আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কাছে ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল - এই তিনের সমন্বয়। ভ্রান্ত ফিরকাগুলো একেকটি অংশকে সম্পূর্ণ ঈমান মনে করেছে বিপরীতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সবগুলো বিষয়ের সমন্বিত রূপকে ঈমান মনে করে। মুরজিয়া ও জাহমিয়াহরা ঈমানকে কেবল জানা কিংবা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত করে, অপরদিকে কাররামিয়াহরা ঈমানকে কেবল মুখের স্বীকৃতি মনে করে। খারেজী ও মুতাযিলারা কবীরাহ গুনাহকে ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কাছে ঈমান হলো অন্তরের জানা, সত্যায়ন, গভীর বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল সবকিছুর সমষ্টি।

তাত্ত্বিকভাবে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন মাযহাবের মাঝেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহদের সঙ্গে ইমাম আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তথা হানাফী এবং আশআরীদের ঈমানের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। আশআরীদের মতে ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন, ইমাম আজমের মতে ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের সত্যায়ন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফের মতে ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল সবগুলো।

## ঈমান ও আমলের সম্পর্ক

ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং আহলে বিদআতের ফিরকাগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। খারেজীগণ এবং তাদের সমমনা ফিরকাগুলো আমল বা ইসলামের বিধানমত কর্ম করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করেছে। ফলে বিধান পালনের বিচ্যুতি তাদের কাছে ঈমানের বিচ্যুতি অর্থাৎ কুফর বলে গণ্য। অপরদিকে মুরিজিয়াগণ ঈমানকে আল্লাহর নির্দেশ পালন বা ইসলামের বিধি-বিধান পালন

থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন গণ্য করেছে। তাদের মতে কোনরূপ ইসলাম পালন ছাড়াই ঈমানের চূড়ান্ত পূর্ণতায় পৌঁছানো সম্ভব। তারা পাপী মুসলিমকে পরিপূর্ণ ঈমানদার এবং নিশ্চিত জান্নাতী বলে গণ্য করেছে। উভয় মতের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, পাপী মুমিন কাফির নয়, আবার ঈমানের পূর্ণতাও তিনি লাভ করেননি। তবে এ বিশ্বাসের ব্যাখ্যায় আহলে সুন্নাতের ইমামগণের পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের দুটি মত রয়েছে।

১) ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এবং অন্যান্য কোনো কোনো ইমামের মতে আমল বা বিধান পালন ঈমানের অংশ নয়, বরং ঈমানের দাবী ও সম্পূরক। তাদের মতে ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখে সে বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। তাদের মতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে স্বীকৃতি বেশী কম হয় না বা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। তবে বিশ্বাসের গভীরতার দিক থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

২) অন্য তিন ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ বলেন যে আমল বা কর্ম ঈমানের অংশ,তবে অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতির মতো অংশ নয়, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ। এজন্য তাদের মতে কর্মের অনুপস্থিতি দ্বারা ঈমানের অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয় না, তবে দুর্বলতা ও কমতি প্রমাণিত হয়। তারা বলেন ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও দেহের কর্ম। এদের মতে কর্মের কারণে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

এ দু-মতের মধ্যে শব্দ প্রয়োগে যতই মতপার্থক্য থাক না কেন, মূল বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ উভয় মতের অনুসারীরাই একমত যে,

১) ঈমান ও আলম দুটোই আল্লাহর নির্দেশ এবং বান্দাকে দুটিই অর্জন করতে হবে। ঈমানবিহীন ইসলাম বা ইসলামবিহীন ঈমান অকল্পনীয়।

২) কর্মের ত্রুটির কারণে বা কাবীরাহ গুনাহের কারণে বান্দা কাফির হয় না, আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হয়। আল্লাহ চাইলে শাস্তি দিতে পারেন বা আল্লাহ চাইলে মাফও করে দিতে পারেন।

## ঈমানের গুরুত্ব ও ফযিলত

বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় হক এবং সবচেয়ে বড় ফরয হলো ঈমান। ঈমানই বান্দার প্রকৃত সম্পদ এবং এটি তার জীবন ও প্রাণ। সৃষ্টিকর্তা মহান প্রভুর মহব্বত লাভ এবং

তার কাছে সম্মানিত হওয়ার এ-ই প্রধানতম পথ এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের এ-ই প্রধানতম পন্থা। ঈমান ছাড়া কোন নেক আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ঈমানের গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলোঃ

**১. ইসলামের প্রথম ভিত্তি ঈমানঃ**

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথমটি হলো ঈমান তথা আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রসুল, এই সাক্ষ্য দেওয়া।

ইবনে উমার রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

**بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ**

ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, সলাত কায়িম করা, যাকাত আদায় করা, হাজ্ব সম্পাদন করা এবং রমযানের রোযা রাখা। সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৮।

এই হাদীসের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নামাজ, রোযা, হাজ্ব, যাকাত প্রভৃতি আমলের পূর্বে প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে ঈমান আনা। যুগে যুগে সমাজে নানাবিধ খারাপ কাজ চালু থাকলে সকল নবী-রসুলদের প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিলো ঈমানের দাওয়াত দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

**وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ**

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূলই পাঠাইনি যার প্রতি আমি ওহী করিনি যে, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। কাজেই তোমরা আমারই ইবাদাত কর। সুরাহ আম্বিয়া, আয়াত - ২৫।

মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রথমে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি বলতেন -

**قُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، تُفْلِحُوْا**

তোমরা বলো আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং - **১৬০৬৬**।

সাহাবায়ে কেরামকেও প্রথমে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রঃ বলেন -

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا ـ رضى الله عنه ـ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،**

নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসেবে) প্রেরণ করেন। অতঃপর বললেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহবান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। সহিহ বুখারী, হাদিস নং **১৩৯৫**

**২. ঈমান শুদ্ধ করা সর্বোত্তম আলমঃ**

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

**وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ**

যার ঈমান শুদ্ধ নয় তার সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ "**

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ আমলটি উত্তম?' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৬

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সবকিছুর আগে ঈমান-আকীদা শিখেছেন।

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ـ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا "

জুনদুব বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমরা কিশোররা নবী (সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তার দ্বারা আমাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৬১, সনদ সহীহ।

তাবারানীর বর্ণনার শেষে এসেছে,

فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ.

'আজ তোমরা ঈমান শিখার আগে কুরআন শিখছো'

আফসোস মুসলিম উম্মাহ আজ সবকিছু শিখছে, কেবল ঈমনটাই শিখছে না।

ইমাম আবু হানিফা রহঃ বলেন - দ্বীন ও আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন বিধি-বিধান ও হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম ফিকহ কোনটি? তিনি বললেন - ঈমান শিখা, শরীয়ত, সুন্নাত, হদ-কিসাস ও উম্মাহর ইমামদের মতামত ইত্যাদি জানা।

নিজের দ্বীন রক্ষা ও বিভ্রান্তি-বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্যও ঈমানের জ্ঞান শিক্ষা অর্জন করা আবশ্যক। তাই ঈমান-আকীদার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে শৈশব থেকেই এর শিক্ষাদান শুরু করতে হবে।

**৩. ইবাদত কবুলের জন্য অন্যতম শর্ত ঈমানঃ**

আল্লাহর নিকট আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে ঈমান। রূহবিহীন শরীরের যেমন কোনো মূল্য নেই ঠিক তেমন ঈমানবিহীন আমলেরও কোনো মূল্য নেই। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমান ছাড়া আখিরাতে আমলের কোনো প্রতিদান নেই, বরং বিভিন্ন উপমা ও উদাহরণ টেনে বিষয়টি সূর্যের আলোর ন্যায় পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

وَقَدِمْنَآ اِلٰي مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

তারা (দুনিয়ায় ঈমানবিহীন ব্যক্তিরা) যা-কিছু আমল করেছে, আমি তার ফায়সালা করতে আসব এবং সেগুলোকে শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মত মূল্যহীন) করে দেবো।

**৪. ঈমানের পুরস্কার জান্নাতঃ**

ঈমান অবস্থায় কারও মৃত্যু হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুআয ইবনে জাবাল রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যারা সর্বশেষ বাক্য হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩১১৬, সহিহ হাদিস।

সেজন্য রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তথা কালিমার তালকীন দিতে তাগিদ দিয়েছেন।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

তোমাদের মৃত্যুপথ যাত্রীকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" তালক্বীন দাও। সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩১১৭, সহিহ হাদিস।

**৫. ঈমানের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভঃ**

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا ـ أَوِ الْحَيَاةِ، شَكَّ مَالِكٌ ـ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً

জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা ফেরেশতাদের বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হতে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের হায়াতের নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়? সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২২।

ঈমানদার ব্যক্তির আমল কম থাকলেও শাস্তি ভোগ করার পরে শুধুমাত্র ঈমানের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। আবু হুরায়রা রাঃ বর্ণনা করেন, রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

**مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ, يُصِيْبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ.**

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, এটা একদিন তার উপকারে আসবে। তবে এর আগে শাস্তি ভোগ করবে। মুসনাদে বাযযার, হাদীস নং ৮২৯২, সনদ সহীহ।

**৬. ঈমানবিহীন মৃত্যুর ঠিকানা চিরস্থায়ী জাহান্নামঃ**

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

**اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ**

নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে ও মুশরিকরা, জাহান্নামের আগুনে থাকবে চিরস্থায়ীভাবে। ওরাই হল নিকৃষ্ট সৃষ্টি। সুরাহ বায়্যিনাহ, আয়াত নং - ৬।

**اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝**

নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের লা’নত। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। সুরাহ বাকারাহ, আয়াত ১৬১-১৬২।

**৭. শিরক ও কুফরের গুনাহের কোনো ক্ষমা নেইঃ**

সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। শিরকের গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। পবিত্র কুরআনের সুরাহ নিসার ৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓي اِثْمًا عَظِيْمًا

আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার পাপ কিছুতেই ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহর সাথে (কোনকিছু) শরীক করে নিঃসন্দেহে সে এক বিরাট পাপ করে।

কুফর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا

নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথ দেখাবেন না, জাহান্নামের পথ ছাড়া। তারা তাতে চিরস্থায়ী হবে এবং তা আল্লাহর জন্য সহজ।

অর্থাৎ শিরক ও কুফর অপেক্ষা নিচের গুনাহ, যা ঈমান ভঙ্গকারী নয়, তা আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবার কারণে ক্ষমা করে দিতে পারেন অথবা বিনা তাওবায় নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন। শিরক ও কুফরের গুনাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা হতে পারে না, যতক্ষণ না মৃত্যুর আগে খাঁটি মনে তাওবা করে পুনরায় ইসলাম, ঈমান ও তাওহীদ কবুল করে নিবে।

সেজন্য মুমিন হওয়ার পর ঈমান-আকীদা হেফাজত করা ফরয এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস, কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরী।

# ঈমান ও এর অপরিহার্য অনুষঙ্গ

ঈমান শুধু মুখে কালিমা পড়ার নাম নয়, ইসলামকে তার সকল অনুষঙ্গসহ মনেপ্রাণে কবুল করার নাম। আর এ কারণে মুমিনকে হতে হবে সুদৃঢ়, সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ। মুমিন কখনো শৈথিল্যবাদী হতে পারে না। কুফরির সাথে যেমন তার সন্ধি হতে পারে না তেমনি মুরতাদ ও অমুসলিমের সাথেও বন্ধুত্ব হতে পারে না। তাই ইসলামের পূর্ণ পরিচয়, তার অপরিহার্য দাবী এবং অনুষঙ্গগুলো সম্পর্কে জানা একজন মুসলিমের জন্য অতীব জরুরী। নিম্নে ঈমানের অপরিহার্য অনুষঙ্গ এবং শর্তগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

## ১. ঈমানের ভিত্তি ওহীঃ

ওহীর মাধ্যমে জানা সকল সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। অজ্ঞতা, অনুমান আর কল্পনা-কুসংস্কারের কোনো অবকাশ ঈমানে নেই। ঈমান ঐ সত্য সঠিক আকীদাকে স্বীকার করা এবং সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম, যা আসমানী ওহী দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। যে ওহী আল-কুরআনুল কারীম এবং আস-সুন্নাতুন নাবাবিয়াহ রূপে এখনো সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

## ২. ঈমান অবিচল বিশ্বাসের নামঃ

ঈমানতো অবিচল ও দৃঢ় বিশ্বাসের নাম, মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও সত্যায়নের নাম। এতে কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয়, দ্বিধা, দোদুল্যমানতা, সিদ্ধান্তহীনতা, অস্পষ্টতা থাকতে পারে না। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

**إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ**

মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর কোনরূপ সন্দেহ করে না, আর তাদের মাল দিয়ে ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী। সুরাহ হুজরাত, আয়াত - ১৫।

সংশয় ও দোদুল্যমানতা কাফির ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য, মুমিনের নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ أَن يُجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ۝ إِنَّمَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ۝

যারা আল্লাহয় ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে তারা তাদের মাল দিয়ে আর জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তোমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে না। মুত্তাকীদের সম্পর্কে আল্লাহ খুবই অবগত আছেন। তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা তারাই করে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না, যাদের অন্তর সন্দেহপূর্ণ, কাজেই তারা তাদের সন্দেহের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সুরাহ তাওবা, আয়াত - ৪৪-৪৫।

### ৩. শুধু আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে মেনে নেওয়াঃ

ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোকন হলো কোন বিষয়কে আল্লাহ ও তার রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আস্থার ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেওয়া এবং বিশ্বাস করা। ঈমান-ইসলামের অকাট্য বিষয়সমূহ আমার বিবেকে বুঝে আসুক বা না আসুক, আমার জ্ঞান-বুদ্ধিতে ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, বিজ্ঞানসম্মত হোক বা না হোক, কোন বৈশ্বিক শক্তি মেনে নিক বা না নিক, যেমনই হোক না কেন, বিষয়গুলোর উপর আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি সর্বোচ্চ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে ঈমান আনতে হবে ও মেনে নিতে হবে।

কোনো মুমিন যখন জানতে পারে এটি আল্লাহ তা'আলার বিধান, তার শরীয়তের বিধান তখন সে বিনা দ্বিধায় কালবিলম্ব না করে বলে উঠে -

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। সুরাহ নূর, আয়াত - ৫১।

ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا

আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, এ সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে। সুরাহ আলি-ইমরান, আয়াত - ৭।

ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার, কুরআন-হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও সর্বসম্মতভাবে ইসলামের কোন বিষয় অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক নয় এবং ইসলামে বিবেকবিরূদ্ধ কোন কথা নেই। কেননা, ওহীর জ্ঞানের সাথে এসবের কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সাংঘর্ষিক হতেই পারে না।

যদি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা অন্য কোন মাধ্যমে ইসলামের কোনো বিধানের যৌক্তিকতা উন্মোচিত হয়, তখন মনে করতে হবে এইটা বিজ্ঞানের সক্ষমতা ও সফলতা। অর্থাৎ এখানে বিজ্ঞান সফল হয়েছে যে, ইসলামী বিধানের যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছে। আর যেখানে যৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি বা উন্মোচিত হয়নি, সেখানে মনে করতে হবে বিজ্ঞান এখানে ব্যর্থ। অর্থাৎ বিজ্ঞান এখনো এই বিষয়ে অক্ষম, তাই এখনো তাই ধরতে পারেনি।

সুতরাং কখনো যদি ইসলামের কোনো বিধান বিজ্ঞান, যুক্তি বা মানবরচিত কোনো মতবাদের বিপরীত মনে হয়, তখন এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ ও তার রসুল যা বলেছেন তাই চিরন্তন সত্য ও যুক্তিযুক্ত। আর বিজ্ঞান এখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি বা সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি বিধায় এর যৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি এবং প্রকাশ করতে পারেনি। এটাই হবে একজন মুমিনের বিশ্বাসের মাপকাঠি।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিধানের প্রতি আস্থার অভাবে ঈমান আনতে বিলম্ব করা ও কালক্ষেপণ করাও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। এর দরুন কাফিরের কুফরি প্রলম্বিত হতে থাকে। আর কালিমা পাঠকারী কোনো মুসলিম এমনটি করলে সে মুরতাদ হয়ে যায়।

**৪. গায়েবের প্রতি ঈমানঃ**

ঈমানের মূল ভিত্তিই হচ্ছে গায়েব তথা অদৃশ্য-অদেখা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় - এমন বিষয় ও বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে যা বর্ণনা করেছেন এবং রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হাদীসে ইরশাদ করেছেন - সেসবের প্রতি ঈমান আনতে হবে যদিও তা পঞ্চইন্দ্রিয় তথা চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বা দিয়ে অনুভব করতে না পারি। স্বচক্ষে দেখার পরে ঈমান আনার আর কী আছে? কারণ চোখে দেখা বিষয়কে সবাই বিশ্বাস করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান বিষয়সমূহ ঈমানের বিষয়বস্তু হতে পার না। এসবতো মানুষ এমনিতেই মেনে নেয়। এতে ঈমান আনা না আনার প্রশ্নই অবান্তর। দেখা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান নয়। মুমিনকে তো শুধু এজন্যই মুমিন বলা হয় যে, সে না দেখা বিষয়ে শুধু আল্লাহ ও তার রসুলের সংবাদের উপর ভিত্তি করে মেনে নিয়েছে ও বিশ্বাস করেছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে মুমিনের গায়েবে বিশ্বাস করার এই গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন -

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়িম করে এবং আমি যে জীবনোপকরণ তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। সুরাহ বাকারাহ, আয়াত - ৩।

যারা কুরআন মাজীদের হেদায়েত দ্বারা উপকৃত হয়, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গুণ এই যে, তারা গায়েব তথা মানুষের দৃষ্টি ও চাক্ষুষ দেখার অগোচরের বিষয়াবলীর উপর ঈমান রাখে। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, রসুলের সত্যায়ন, ফেরেশতা, জিন, শয়তান, কিয়ামত এবং জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির উপর ঈমান আনা। এভাবে ঈমান সংক্রান্ত অনেক বিষয় গায়েবের অন্তর্ভুক্ত।

**৫. সত্যের সাক্ষ্যদান এবং আরকানে ইসলাম পালনঃ**

অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখেও সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া ঈমানের অন্যতম রোকন। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ**

ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। তন্মধ্যে এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল, সলাত কায়িম করা, যাকাত আদায় করা, হাজ্ব সম্পাদন করা এবং রমযানের রোজা রাখা। সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৮

হকের সাক্ষ্য দেওয়া মুমিনের পরিচয়। মুমিন কখনো সত্য গোপন করে না। অর্থাৎ সত্য জেনেও তা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে না। কখনো মিথ্যা ও অবাস্তব সাক্ষ্যও দেয় না। অসত্য ও অবাস্তব সাক্ষ্য দেওয়াতো কাফির মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য। মুমিনতো এমন সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে।

মুমিন হওয়ার জন্য শুধু আল্লাহ, রসুল এবং ইসলামের বিভিন্ন বিশ্বাস ও বিধানের বিষয়ে সত্য সাক্ষ্য দিলেই হবে না, সাথে সাথে ইসলামের বিধানাবলীর প্রতি আনুগত্য করা, নিজের উপর অবধারিত এবং পালনীয় হিসেবে মেনে নেওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। কাজেই ইসলামের বিধানাবলীর প্রতি আনুগত্য এবং তা পালনীয় হিসেবে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করা না হলে মুমিন হওয়া যাবে না। যদি কেউ পালনীয় হিসেবে মেনে নেওয়ার পর সে অনুযায়ী আমল না করে, তাহলে ফাসিক ও গুনাহগার হলেও ঈমানহারা হবে না।

**৬. ঈমান অর্থ সমর্পণঃ**

ঈমান আনার অনিবার্য অর্থ, বান্দা নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। তার প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করবে। আল্লাহর উপর ঈমান আর আল্লাহর বিধানে আপত্তি একত্রিত হতে পারে

না। রসুলের উপর ঈমান আর তার আদর্শের উপর আপত্তি, কুরআনের উপর ঈমান আর তার কোনো আয়াত বা বিধানের উপর আপত্তি একত্রিত হতে পারে না। মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমর্পণ আর ইবলিশ ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুক্তি। এখনতো শুধু আপত্তি বা বিপরীত যুক্তিই নয়, আল্লাহ, রসুল কুরআন এবং ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহকারীকেও মুসলিম মনে করা হয়। কারো প্রতি ঈমান এবং তার বিরোধিতা দুটো কখনো একত্রিত হতে পারে না। সমর্পণবিহীন ঈমানের কথা কল্পনাও করা যায় না। আর তা কখনো গ্রহণযোগ্যও হবে না। এ তো সরাসরি ঈমানের সাথে বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আঃ এর ঈমানের কথা বলেছেন এভাবে -

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ কর', উত্তরে সে বলল, 'আমি সারা জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম'। সুরাহ বাকারাহ, আয়াত - **১৩১**।

সুরাহ আলি-ইমরানের **১০২** নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না।

## ৭. ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য সকল ধর্ম, মতবাদ ও আদর্শ থেকে বিমুখতা ও সম্পর্কহীনতা আবশ্যকীয়ঃ

ঈমান শুধু গ্রহণের নাম নয়, সাথে বর্জনও করতে হয়। হক ও সত্যকে গ্রহণ এবং বাতিল ও মিথ্যাকে বর্জনের নাম ঈমান। কারণ কোনো কিছু গ্রহণ ও মেনে নিতে হলে তার বিপরীত বিষয় বর্জন ও অস্বীকার করতে হয়। অন্যতায় তা হবে স্ববিরোধিতা, যা কোনো সুস্থ বিবেক গ্রহণ করতে পারে না।

সুতরাং ঈমানদার হতে হলে তাওহীদ-ঈমান গ্রহণের পাশাপাশি যাবতীয় শিরক-কুফর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা অপরিহার্য এবং ইসলামবিরোধী সকল ধর্ম, কাজ, মতবাদ ও আদর্শ থেকে বিমুখতা ও সম্পর্কহীনতা প্রদর্শন করা এবং এগুলো অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা আবশ্যকীয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰي لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ

নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যে মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়। সুরাহ বাকারাহ, আয়াত - ২৫৬।

আমাদের ঈমানের কালিমার মধ্যে দুটি অংশঃ

১) লা-ইলাহা অর্থাৎ আল্লাহ ও তার দ্বীন ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম, বাতিল মতবাদ ও আদর্শকে অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা।

২) ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং একমাত্র তার মনোনীত দ্বীন ইসলামকেই বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

অর্থাৎ সব মিথ্যা মাবুদ, বাতিল মতবাদ, ধর্ম ও আদর্শকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র আল্লাহর উপর এবং আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের উপর ঈমান আনতে হবে।

**৮. ঈমানের সবচেয়ে বড় রোকন তাওহীদ, শিরক মিশ্রিত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়ঃ**

ঈমানের সর্বপ্রথম রোকন হচ্ছে 'ঈমান বিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান। আর ঈমান বিল্লাহর প্রথম কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব স্বীকার করা, একমাত্র তাকেই রব ও সত্য মাবুদ বলে স্বীকার করা ও মানা, রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের বিষয়ে তার সাথে কাউকে শরীক না করা। একমাত্র আলিমুল গায়েব, হাজির-নাজির, মুখতারে কুল (সব বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী), মুশকিল কুশা (সংকট মোচনকারী), বিপদ-আপদে তাকেই ত্রাণকর্তা মনে করতে হবে। তার বিশেষ হক ও একান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহে কাউকে শরীক করা যাবে না। সাধারণ কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, জীবন-মৃত্যু, উপকার-অপকার, সুস্থতা ও নিরাপত্তা একমাত্র তারই হাতে। রিযিকদাতা একমাত্র তিনিই। গোটা জগতের এক, অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রকও তিনিই। শরীয়ত দান ও হালাল-হারাম নির্ধারণ একমাত্র তারই অধিকার। এতে কাউকে শরীক করা যাবে না - না কোনো মতবাদ, না কোনো দার্শনিক বা নেতা, না কোনো রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়কে। মোটকথা তাওহীদকে পূর্ণরূপে ধারণ করা ও শিরক থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা ঈমানের সবচেয়ে বড় রোকন। মুশরিকের ঈমান কোনো ঈমানই নয়।

মুশরিকের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অভিযোগ করে বলেন -

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। সুরাহ ইউসুফ, আয়াত - ১০৬।

আল্লাহ তা'আলা শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰٓي اِثْمًا عَظِيْمًا

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করলো। সুরাহ নিসা, আয়াত - ৪৮।

আর শিরকের শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। সুরাহ বায়্যিনাহর ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ

কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কুফুরী করে তারা আর মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। এরাই সৃষ্টির অধম।

## ৯. ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়সমূহ নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা ও রূপ-পদ্ধতিসহ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করাঃ

ঈমানের অন্যতম শর্ত হলো ইসলামে অকাট্যভাবে ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলো মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও সত্যায়ন করতে হবে। যে সকল বিষয় কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীস (অসংখ্য সূত্র, যাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না) দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত অথবা ইসলামের অংশ হওয়াটা প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত কিংবা ইমামগণের ঐক্যমত্যপূর্ণ, এগুলো সবই বিশ্বাস করতে হবে।

আল্লামা আবুশ শাকুর সালিমী রহঃ (মৃ. ৪৬০ হিজরীর পর) লিখেন -

‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মতে ঈমানের জন্য শর্ত হলো সেসব বিষয়, যেগুলোর উপর ঈমান আনা আবশ্যক, যা ছাড়া ঈমান বিশুদ্ধ হয় না এবং যা অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে, ঐসব বিষয় যা নস (অকাট্য ও সুস্পষ্ট) বা মুতাওয়াতির হাদীস (অকাট্যভাবে প্রমাণিত সূত্র) কিংবা উম্মাহর ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং তা গ্রহণ করা ও বিশ্বাস করা অপরিহার্য।

আর অকাট্যভাবে ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিষয় আকীদা-সংক্রান্ত হোক বা আমলসংক্রান্ত হোক সব বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে।

অকাট্যভাবে ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলো শুধু বিশ্বাস করলেই হবে না, এগুলোর নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা ও রূপ-পদ্ধতিসহ বিশ্বাস করতে হবে। ইসলাম ও শরীয়ত যেমন বেশ কিছু অকাট্য আকীদা-আমল দিয়েছে, তেমনই এগুলোর অর্থ-ব্যাখ্যা ও পালনের রূপ-পদ্ধতি কি হবে তাও অকাট্যভাবে জানিয়ে দিয়েছে, যা প্রজন্মপরম্পরায় প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। এমন অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যার বিপরীতে ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা-পদ্ধতি বা বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করা কুফরের আলামত। কাজেই ঈমান-আকীদার বিষয়গুলোকে এর অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা ও পালনের রূপ-পদ্ধতিসহ বিশ্বাস করতে হবে।

যেমনঃ কেউ যদি নামাজের প্রতি বিশ্বাস রাখে, কিন্তু কুরআন-হাদীসে এর নির্ধারিত যে অর্থ-ব্যাখ্যা রয়েছে তা গ্রহণ না করে বলে, নামাজ অর্থ মা'রিফাত বা অন্তরে আল্লাহর স্মরণ। অথবা নামাজ আদায়ের অকাট্যভাবে যে রূপ-পদ্ধতি বর্ণিত ও প্রজন্মপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত, তা পালন না করে নতুন কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করে, যেমনঃ হিজবুত তাওহীদের মিলিটিরিয়ান ট্রেনিং এর মতো বিকৃত নামাজ, কিংবা আহলে কুরআন নামধারী হাদীস অস্বীকারকারীদের অভিনব পদ্ধতির নামাজ, অথবা সজল রোশান নাম কুরআনিস্ট (আসলে হাদীস অস্বীকারকারী) এর মতে চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম সালাতের অর্থ হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধি-নিষেধ ছায়ার মতো অনুসরণ করা।

অথবা কেউ পর্দা বিশ্বাস করে, কিন্তু পর্দার যে পদ্ধতি অকাট্যভাবে বর্ণিত ও ধারাবাহিক কর্ম দ্বারা প্রমাণিত, তা বিশ্বাস করে না, বরং ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করে অথবা বলে মনের পর্দাই আসল পর্দা, এগুলো যদি কেউ প্রকৃত ইসলামের নামে বলে বা করে তাহলে সে মুমিন নয়।

দ্বীনকে অপব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা ‘সাবীলুল মুমিনীন'কে মানদণ্ড বানিয়েছেন। এবং ‘সাবীলুল মুমিনীন’ (মুমিনের সর্বসম্মত পথ) থেকে বিচ্যুতিকে আল্লাহর রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধতার মতো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সাব্যস্ত

করেছেন। এ কারণে কোনো ইসলামী আকীদা বা হুকুমের এমন সব ব্যাখ্যার গন্তব্য জাহান্নাম, যা উম্মাহর সর্বসম্মত ব্যাখ্যার বিরোধী।

সুরাহ নিসার ১১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

**وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰي وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰي وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا**

যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস!

**১০. মুয়ালাত ও বারাআত হবে ঈমানের ভিত্তিতেঃ**

ঈমানের একটি দাবী হলো কারো সাথে বন্ধুত্ব (মুয়ালাত) এবং সম্পর্কচ্ছেদ (বারাআত) হবে ঈমানে ভিত্তিতে। অমুসলিমদের কাছে ভূখণ্ড, সংস্কৃতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, ভাষা ও রাজনৈতিক দল ইত্যাদি বিভিন্ন মানদন্ডের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারিত হয়, আর এই জাতীয়তাই তাদের কাছে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগীতার মানদন্ড হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এটি জাহিলিয়াত। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ, ভাষা, বংশ ও ভূখণ্ড নির্বিশেষে সকল মুমিন এক জাতি। অন্যান্য অমুসলিম বিভিন্ন জাতি হলেও ইসলামের বিপরীতে তারা অভিন্ন জাতি। "আলকুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা" (সকল কুফর অভিন্ন মিল্লাত) যেমন শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত তেমনি তা বাস্তবতাও বটে।

মুমিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে মুমিন তা সে যে বর্ণের, যে ভাষার, যে বংশের বা যে দেশেরই হোক না কেন। আর তার রাজনৈতিক পরিচয়ও যাই হোক না কেন। মুমিনের সাথে বন্ধুত্ব হবে ঈমানের কারণে এবং আল্লাহর জন্য। এজন্য মুমিনের বিপদ-আপদে সর্বদা তার পাশে দাঁড়াবো, তার সাহায্যে এগিয়ে আসবো। তবে আল্লাহর নাফরমানীর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সাহায্য করা যাবে না।

আর একজন অমুসলিমের সাথে একজন মুমিনের কখনো বন্ধুত্ব হতে পারে না। তার সাথে আমার বিদ্বেষ একমাত্র আল্লাহর জন্যই। কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

**يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓي اَوْلِيَآءَ ۘۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ**

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদ ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। সুরাহ মায়িদা, আয়াত ৫১।

কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদের অর্থ তার উপর জুলুম করা নয়, বিপদগ্রস্ত হলে সহযোগিতার হাত না বাড়ানো নয় এবং তাকে মাজলুম অবস্থায় দেখে চুপ থাকা নয়, বরং সামর্থ্য থাকলে বিপদগ্রস্তকে সহযোগিতা করা এবং জুলুম থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসা।

# ঈমানের রুকনসমূহ

ঈমানে মূল ভিত্তি ছয়টি। এগুলোকে ঈমানের রুকন বলা হয়। সুরাহ নিসার ১৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

**يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰي رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝**

হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন -

**اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ**

আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। সুরাহ ক্বমার, আয়াত নং ৪৯।

সুরাহ ইনসানের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন -

**وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ**

এবং তোমরা ইচ্ছে কর না আল্লাহর ইচ্ছে ব্যতীত।

প্রসিদ্ধ হাদীসে জিবরীল এ বর্ণিত আছে, যেখানে ফেরেশতা জিবরীল আঃ মানুষের রূপ ধারন করে রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে তাকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন - ঈমান হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রসুল - এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া। আল্লাহর ফেরেশতা, কিতাব, রসুল, পরকাল এবং তাকদীরের ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করা।

উপরোল্লেখিত কুরআনের আয়াত এবং হাদীস থেকে জানতে পারি, ঈমানের রুকন ছয়টি। যথাঃ

১. আল্লাহর উপর বিশ্বাস,
২. ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস
৩. আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস,
৪. নবী-রসুলগণের উপর বিশ্বাস,
৫. আখিরাত অর্থাৎ পরকালের উপর বিশ্বাস এবং
৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস

নিম্নে ঈমানের রুকনগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলোঃ

**১. আল্লাহর উপর বিশ্বাসঃ**

ঈমানের রুকনগুলোর মধ্যে প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে ঈমান বিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান। আর আল্লাহর উপর ঈমানের মূল কথা হচ্ছে তাওহীদ। এই তাওহীদই ইসলামের প্রথম এবং প্রধান মূলনীতি, যার উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের বুনিয়াদ ও ভিত্তি।

**তাওহীদঃ**

আরবীতে ‘তাওহীদ’ শব্দটি ‘ওয়াহদাতুন’ ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। এর অর্থ একক হওয়া, অতুলনীয় হওয়া। পরিভাষায় তাওহীদ হলো আল্লাহ তা'আলাকে তার সত্ত্বা, সর্বসুন্দর নাম, গুণাবলী এবং তার অধিকার, কর্ম ও কর্তৃত্বে এক, একক ও অদ্বিতীয় ঘোষণা ও সাব্যস্ত করা এবং তিনিই একমাত্র ইলাহ ও ইবাদতের উপযুক্ত বিশ্বাস করে একমাত্র তারই ইবাদত করা। এগুলোর কোনোটাতেই কাউকে বা কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক না করা।

আল্লাহর উপর ঈমান বা তাওহীদ সম্পর্কিত আকীদাকে মূলত দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ
১. আল্লাহ তা'আলার জাত ও সত্ত্বা সম্পর্কিত আকীদা। এটি আবার দুই ভাগে বিভক্তঃ

- আল্লাহ তা’আলা সম্পর্কে যে আকীদাসমূহ রাখা আবশ্যক।
- আল্লাহ তা’আলাকে যে আকীদাসমূহ থেকে চিরপবিত্র মনে করা আবশ্যক।

২. আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাত সম্পর্কিত আকীদা।

## আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যে আকীদাসমূহ রাখা আবশ্যক

১. আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়, যার কোন শরিক এবং সমকক্ষ নেই। আল্লাহ তা'আলার জাত ও সত্ত্বার ক্ষেত্রে যেমন কাউকে শরীক করা যাবে না, তেমনই তার নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা যাবে না।

২. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন ইলাহ বা মাবুদ নাই।

৩. তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি এবং তার থেকে কেউ জন্ম নেয়নি।

৪. তিনিই একমাত্র ফয়সালাকারী এবং একমাত্র বিচারক। তিনি ইচ্ছা করলে তার ফয়সালা পরিবর্তন করতে পারেন অথবা বাতিলও করতে পারেন।

৫. আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কুফর। এই অবস্থায় মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

৬. আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন।

৭. সকল অবস্থা যেমন ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, স্বচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, আরাম-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদির খালিক এবং মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এ সকল অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং কোন অবস্থাতেই এগুলি আল্লাহর হেকমত থেকে খালি নয়।

৮. সবকিছু আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী কিন্তু আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন।

৯. আল্লাহ তাআলা ও তার সকল সিফাত বা গুণ আজালি তথা অনাদি। ইমাম তহাবী রহঃ বলেন - আল্লাহ তা'আলা তার যাবতীয় অনাদি গুণসহ সমুদয় সৃষ্টির পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিলেন। মাখলুক সৃষ্টির পর তার মাঝে এমন কোন সিফাত বা গুণের সংযোজন ঘটেনি যা মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে তার সিফাতরূপে ছিলো না।

১০. আল্লাহ তা’আলা ও তার সকল সিফাত আবাদী তথা চিরস্থায়ী।

১১. একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল প্রকার ইবাদতের উপযুক্ত, তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়।

১২. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না। আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে তিনি গঠিত নন।

১৩. তিনি সমগ্র সৃষ্টির একক নিয়ন্ত্রক, যার কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা পায় না।

১৪. আল্লাহ তা’আলাই একমাত্র জীবন দানকারী এবং মৃত্যু দানকারী। মৃত্যুর পর তিনিই আবার সবাইকে পুনর্জীবন দান করে উত্থিত  করবেন।

১৫. এমন কোন জিনিস নেই যা তাকে পরাস্ত ও অক্ষম করতে পারে। অথবা তার কোন ফয়সালা কার্যকর করা থেকে বাঁধা দিতে পারে।

১৬. মানুষ তার বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি দ্বারা আল্লাহ তা’আলা পর্যন্ত পৌঁছতে ও তাকে আয়ত্ত করতে অক্ষম।

১৭. আল্লাহ তা’আলা সব কিছু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

১৮. আল্লাহ তা’আলা সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৯. আল্লাহ তা’আলা সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।

২০. আল্লাহ তা’আলা একক ইচ্ছা শক্তির অধিকারী।

২১. আল্লাহ তা’আলা কথা বলেন তবে আল্লাহ তা'আলার কথা এবং আমাদের কথা এক নয়। আল্লাহ তা’আলার কথা শব্দ, শ্বর এবং যাবতীয় বিভাজন থেকে চির পবিত্র।

২২. আল্লাহ তা’আলা তার জ্ঞান এবং ইচ্ছানুযায়ী যথাসময়ে প্রতিটি বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন। আল্লাহ তা'আলার এই গুণটি অনাদি কিন্তু অস্তিত্বে আসা বস্তুটি সৃষ্ট।

২৩. একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ সকল কিছুর সৃষ্টি কর্তা। তার নিজের কোনো প্রয়োজন ছাড়াই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

২৪. একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রিজিকদাতা। তিনি কোন কষ্ট ছাড়াই সকল সৃষ্টিকে রিজিক দান করেন।

## আল্লাহ তা'আলা কে যে আকীদাসমূহ থেকে চিরপবিত্র মনে করা আবশ্যক

১. আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন থেকে চির পবিত্র।

২. সকল ধরনের দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতা থেকে আল্লাহ তা'আলা চিরপবিত্র। তিনি কখনো অসুস্থ ও দুর্বল হন না।

৩. সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছিলেন। কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী ছিল না তার সত্ত্বা। ছিল না কোন সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত এবং কোন সৃষ্টিও ছিল না তার সত্ত্বার সঙ্গে যুক্ত।

৪. আল্লাহ তা'আলা স্থান থেকে চিরপবিত্র। তিনি সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন এখনো তেমনই আছেন।

৫. আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন দিক, সীমা-পরিসীমা, পরিধি এবং স্থান থেকে চির পবিত্র।

৬. আল্লাহ তা'আলার জাত ও সত্ত্বা স্বাদ, কষ্ট ও ব্যথা ইত্যাদি গ্রহণ থেকে চির পবিত্র।

৭. আল্লাহ তা'আলা এমন কোন সত্ত্বা নন যা শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত বরং তিনি শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে চির পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা দেহ ও শরীর থেকে চিরপবিত্র।

৮. আল্লাহ তা'আলা দেহের জন্য অপরিহার্য যেমন পানাহার করা, ফর্সা-কালো, লম্বা-খাটো ইত্যাদি সকলকিছু থেকে চির পবিত্র।

৯. আল্লাহ তা'আলা আকার-আকৃতি থেকে চির পবিত্র।

১০. আল্লাহ তাআলার জাত ও সত্ত্বা, এবং তার সকল সিফাত কাইফিয়াত তথা ধরন থেকে চিরপবিত্র।

১১. সত্ত্বাগত দিক দিয়ে বা গুণগত দিক দিয়ে সৃষ্টির কোনকিছুই আল্লাহ তা'আলার মতো ও সদৃশ নন এবং তিনিও কোন সৃষ্টির মতো ও সদৃশ নন।

১২. আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা এবং তার সকল সিফাত অপরিবর্তিত।

১৩. নাড়াচড়া, স্থানান্তর, স্থির হওয়া, ওঠা-বসা এবং সৃষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য থেকে আল্লাহ তাআলা চির পবিত্র।

# আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাত সম্পর্কিত আকীদা

**আল্লাহ তা'আলার নাম সম্পর্কিত আকীদাঃ**

১. আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। যেমন তিনি ইরশাদ করেন -

**وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰي فَادْعُوْهُ بِهَا**

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। সূরা আরাফ, আয়াত নং ১৮০।

রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি অর্থাৎ এক কম ১০০টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি নামসমূহ মুখস্ত রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। বুখারী, হাদীস নং ২৭৩৬।

২. আল্লাহ তাআলার সকল নাম ও সিফাত তাউফিকি এবং তার নাম সমূহ কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। তবে হাদীসে ৯৯ টি বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ৯৯ টি নাম মুখস্তের ফযিলত বর্ণনা করা।

৩. আল্লাহ তাআলার নাম ও সত্তা এক নয় বরং ভিন্ন, তবে তার নাম ও গুণ সত্তা থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্নও নয় এবং তার নাম ও গুণ তার সত্তার মতোই অনাদি।

৪. কিছু নাম শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, ফলে তা অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা জায়েজ নেই। যেমনঃ

**الله, الرحمن, الخالق, القدوس, الجبار, المتكبر, البري, الرب, الرزاق, الغفار, المصور, القهار, الوهاب, الخلاق, الفتاح, القيوم, المحيط, المالك, الغفور, الأحد, الصمد, الحق, القادر.**

উল্লেখিত নামসমূহের পূর্বে 'আবদ (عبد) শব্দ যোগ করে মানুষের জন্য ব্যবহার জায়েজ। যেমন আবদুর রহমান ইত্যাদি।

**আল্লাহ তা'আলার সিফাত সম্পর্কিত আকীদাঃ**

আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা গুণ পাঁচ প্রকারঃ

**১. আস-সিফাতুন নাফসিয়াঃ**

আস-সিফাতুন নাফসিয়া বলা হয় এমন কিছু শব্দকে, যা আল্লাহ তা'আলার সত্তার বাইরে অতিরিক্ত কোন অর্থ বুঝায় না, বরং শব্দগুলো স্বয়ং তার সত্তাকেই বোঝায়। যেমনঃ الله - আল্লাহ, موجود - তিনি বিদ্যমান, ذات - সত্তা ইত্যাদি।

**২. আস-সিফাতুস সালবিয়াঃ**

আস-সিফাতুস সালবিয়া বলা হয় এমন সিফাতসমূহকে যা তার বিপরীত অর্থকে আল্লাহ তা'আলার জন্য নাকচ করে। এই জাতীয় সিফাত সংখ্যা অনেক তবে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি। যেমনঃ

ক. অনাদি অর্থাৎ তিনি সৃষ্ট নন। রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ আপনি আদি, আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না।

খ. আবাদী অর্থাৎ তিনি চিরস্থায়ী। রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আর আপনিই অন্ত, আপনার পরেও কিছু নেই।

গ. তিনি সত্তা ও সকল গুণে সৃষ্টির ব্যতিক্রম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

তার মত কিছু নেই। সুরাহ শুরা, আয়াত ১১।

ঘ. তিনি স্বনির্ভর এবং কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সবকিছুই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاللهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ

আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্থ। সুরাহ মুহাম্মাদ, আয়াত ৩৮।

اَللهُ الصَّمَدُ ۚ

আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। সুরাহ ইখলাস, আয়াত ২।

৬. তিনি সত্তা ও সকল গুণে এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ

আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সূরাহ বাকারাহ আয়াত নং ১৬৩।

**৩. সিফাতুল মায়ানিঃ**

সিফাতুল মায়ানি বলা হয় এমন কিছু সিফাতকে যা সত্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সত্তার বাইরে অতিরিক্ত অর্থ বহন করে। এই সিফাতগুলোকে সত্তা ভাবা যেমন ভুল তেমন সত্তার বাইরে ভাবাও ভুল। সিফাতুল মায়ানি মোট আটটিঃ ১. জীবন ২. জ্ঞান ৩. ক্ষমতা ৪. ইচ্ছা ৫. কথা ৬. দেখা ৭. শোনা ৮. তাকবীন

বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে উপরোল্লেখিত শব্দগুলো আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে আল্লাহ তা'আলা ও মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও দুইয়ের মাঝে পূর্ণতা ও সীমারেখার পার্থক্য বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে পূর্ণ ও অসীম আর মানুষের ক্ষেত্রে অপূর্ণ ও সসীম।

**৪. আস-সিফাতুল ফেঈলিয়াহ বা কর্মগত সিফাতঃ**

কর্মগত সিফাত বলা হয় সে সকল সিফাতকে যার প্রভাব সৃষ্টির উপর পড়ে এবং তিনি অনাদিকাল থেকে এ সকল গুণে গুণান্বিত। যেমন জীবন ও মৃত্যু দান করা, সৃষ্টি করা, রিজিক দান করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলার কোন সিফাত সৃষ্ট নয় তবে সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত বস্তু সৃষ্ট।

**৫. আস-সিফাতুল খবরিয়াঃ**

আস-সিফাতুল খবরিয়া বলতে এমন কিছু সিফাত কে বুঝানো হয়, কুরআন হাদিসে যার সম্পর্কে ব্যবহার ও বর্ণনা পাওয়া যায়। কুরআন হাদিসে না থাকলে যুক্তি দিয়ে তা সাব্যস্ত করার সুযোগ ছিল না। যেমনঃ وجه - চেহারা, يد - হাত, إصبع - আঙ্গুল, ضحك - হাসা ইত্যাদি।

শব্দগুলো বাহ্যিকভাবে অঙ্গবাচক শব্দ হলেও আল্লাহর ক্ষেত্রে অঙ্গবাচক শব্দ মনে করা যাবে না কারণ আল্লাহ দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে চিরপবিত্র বরং এর প্রকৃত অর্থ এবং ধরন আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করতে হবে। অর্থাৎ আস-সিফাতুল খবরিয়াকে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ ও ধরন ছাড়াই আল্লাহর সিফাতরূপে সাব্যস্ত করতে হবে এবং শব্দগুলোর শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ

তা'আলাকে চির পবিত্র মনে করতে হবে। সাথে সাথে শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের জ্ঞান আল্লাহ তাআলার কাছে ন্যস্ত করতে হবে।

## শিরক

শিরক শব্দের আভিধানিক অর্থ অংশীদারিত্ব, অংশী স্থির করা, সমকক্ষ করা, মিলানো, ভাগাভাগি করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলার সত্তায়, গুণে, কর্মে, কর্তৃত্বে এবং সুন্দর নামসমূহে কাউকে অংশী বানানো, শরীক স্থির করা কে শিরক বলে। শিরক মূলতো দুই প্রকারঃ

১. শিরকে আকবার বা বড়ো শিরক,
২. শিরকে আসগার বা ছোট শিরক।

**১. শিরকে আকবার বা বড়ো শিরকঃ**

শিরকে আকবার বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে ইলাহ হিসেবে অন্য কাউকে শরিক করা। শিরকে আকবার বান্দাকে মুসলিম মিল্লাতের গন্ডি থেকে বের করে দেয়। এ ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি যদি শিরকের ওপরেই মৃত্যুবরণ করে এবং তা থেকে তাওবা না করে তাহলে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغۡفِرُ اَنۡ يُّشۡرَكَ بِهٖ وَيَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِكَ لِمَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَمَنۡ يُّشۡرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيۡدًا

নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল। সুরাহ নিসা, আয়াত ১১৬।

শিরকে আকবার হলো গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া যেকোনো প্রাণী, ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্দেশ্যে কোন ইবাদাত আদায় করা, গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানি করা, মানত করা, কোন মৃত ব্যক্তি বা জ্বিন বা শয়তান কারো ক্ষতি করতে পারে, কিংবা কাউকে অসুস্থ করতে পারে এই ধরনের বিশ্বাস করা, প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করা এবং বিপদ দূর করার ব্যাপারে যেসব বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা রাখে না সেসব বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আশা করা, প্রার্থনা করা, চাওয়া।

আজকাল আউলিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনের কবরকে কেন্দ্র করে এ ধরনের শিরকের প্রচুর চর্চা হচ্ছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ

আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'। সুরাহ ইউনুস, আয়াত ১৮।

**২. শিরকে আসগার বা ছোট শিরকঃ**

যে শিরক বান্দাকে মুসলিম মিল্লাতের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না তবে একত্বাদের আকীদায় ত্রুটি ও কমতে সৃষ্টি করে, তাকে শিরকে আসগার বা ছোট শিরক বলে। এই ধরনের শিরক দু'প্রকারঃ

প্রথম প্রকারের উদাহরণঃ

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর কসম ও শপথ করা। রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কসম করলো সে শিরক করলো। আল বাদরুল মুনীর, ৯/৪৫৮।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণঃ

এ প্রকার শিরকের স্থান হলো ইচ্ছা, সংকল্প ও নিয়তের মধ্যে। যেমনঃ লোক দেখানো ও প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য কোন আমল করা। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এমন কোনো আমল করে তা দ্বারা মানুষের প্রশংসা লাভের ইচ্ছা করা। যেমনঃ মানুষকে দেখানোর জন্য সুন্দরভাবে নামায পড়া, সুনাম-খ্যাতি অর্জনের জন্য দান-খয়রাত করা ইত্যাদি।

**২. ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাসঃ**

একবচন الملك, বহুবচন الملائكة অর্থ ফেরেশতা। ঈমান বিল গায়েব তথা না দেখা বিষয়সমূহের উপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হলো ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি ঈমানের অন্যতম রুকন। ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহ তাআলার বিশেষ এক সৃষ্টি। তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেন না। তিনি যা বলেন তারা যথাযথভাবে তা পালন করেন। তাদের কাজই হচ্ছে সর্বদা এক আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তাদের যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তারা সর্বদা তার ইবাদতের নিয়োজিত আছেন। কেউ সিজদায়, কেউ রুকুতে, কেউ দাঁড়িয়ে, আবার কেউ বসে তার ইবাদত ও তাজবীহ পাঠে সদা মশগুল। তারা কেউ আল্লাহর নির্দেশ পালনে কষ্ট-

ক্লেশ, ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করেন না। এটাই তাদের স্বভাব, এটাই তাদের কাজ এবং এটাই তাদের ধর্ম। আল্লাহ তাদের এ কারণে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাদের প্রকৃত সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না। ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে-

১. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা
২. ফেরেশতাগণের গুণসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা
৩ আল্লাহর আদেশে তারা যে কাজ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা,

নিম্নে এগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলোঃ

**১. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাঃ**

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণেই ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কুরআন ও মুসলমানদের ঐক্যমত্য অনুযায়ী কুফরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

**اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۟ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ**

রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। সুরাহ বাকারাহ, আয়াত ২৮৫।

ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টি-মাখলুক এবং আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন অবাধ্য না হয়ে তারা তা সাথে সাথে পালন করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

**بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ۟ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ**

বরং তারা সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগ বাড়িয়ে কোন কথা বলে না, তাঁর নির্দেশেই তো তারা কাজ করে। সুরাহ আম্বিয়া, আয়াত ২৬-২৭।

**২. ফেরেশতাগণের গুণসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করাঃ**

ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি। রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

خُلِقَتْ المَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ

ফেরেশতাগণকে নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৬।

আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ফেরেশতাগণকে বিভিন্ন সংখ্যক পাখা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰي وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۗ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاۤءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহকরূপে নিযুক্তকারী, যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। সুরাহ ফাতির, আয়াত ১।

রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল আঃ কে ছয়শত পাখা সহ দেখেছেন। আল্লাহর শক্তিতে ফেরেশতাগণ কখনো মানুষের রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন মারইয়াম আলাইহাস সালাম এর নিকটে আল্লাহ তাআলা জিবরীল আঃকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন। এমনিভাবে আল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও লুত আলাইহিস সালাম এর নিকটে ফেরেশতাগণকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ অদৃশ্য জগত। তারাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তার ইবাদত করেন। পালনকর্তা বা মাবুদ হওয়ার কোন যোগ্যতা তাদের নাই বরং তারাই আল্লাহর বান্দা এবং সর্বদা আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করছেন।

**৩. আল্লাহর আদেশে তারা যে কাজ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাঃ**

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের দায়িত্বে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মেঘমালা ও বৃষ্টি পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মাতৃগর্ভে শিশুর দায়িত্বে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। সে শুক্র বিন্দু থেকে শুরু করে

শিশুর গঠন পর্যন্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে। বান্দা যে আমল করে তা সংরক্ষণ করার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। মৃত্যুর জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। কবরে প্রশ্ন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মহাশূন্যের গ্রহ নক্ষত্রের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। চন্দ্র সূর্যের নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। জাহান্নাম, জাহান্নামের আগুন জালানো, জাহান্নামিদেরকে শাস্তি দেওয়া এবং জাহান্নামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। জান্নাত, জান্নাতের পরিচালনা, তাতে বৃক্ষাদি লাগানো এবং তাতে বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত স্থাপন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। ফেরেশতারা আল্লাহর সর্বাধিক বড় সৈনিক। জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে তার রাসূলগণের নিকটে ওহী নিয়ে আসার দায়িত্বপ্রাপ্ত। বৃষ্টি ও তা পরিচালনার দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মিকাইল আলাইহিস সালাম। সিঙ্গায় ফুৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা হলেন ইসরাফিল আলাইহিস সালাম। আত্মাসমূহ কবজ করার দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মালাকুল মাউত ও তার সহযোগীবৃন্দ।

কিরামান কাতেবীনঃ যারা মানুষের কর্মের হিসাব রাখেন। ডান দিকের ফেরেশতাগণ ভালো কাজের এবং বাম দিকের ফেরেশতাগণ খারাপ কাজের হিসাব রাখেন।

## ৩. আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাসঃ

আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস করা আরকানুল ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

**نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ۝ مِنْ قَبْلُ هُدًي لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ**

তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে; যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমুহের। আর তিনি এ কিতাবের পূর্বে মানুষের হেদায়েতের জন্য নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং অবতীর্ণ করেছেন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (কুরআন)।

তিনি আরও ইরশাদ করেন -

**اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰي نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓي اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰي وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۚ**

আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইব্রাহীম,

ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যাবুর। সুরাহ নিসা, আয়াত ১৬৩।

উপরোল্লেখিত আয়াত দুটি থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নবী-রাসূলদের উপর ওহী প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে প্রধান চারটি বড় এবং প্রধান ওহী তথা আসমানী কিতাব হল তাওরাত, যাবুর, ইনজিল এবং কুরআন। এসব আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা মুমিনদের উপর ফরজ। অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোন কিতাবকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

তাওরাত নাযিল হয়েছিল মুসা আলাইহিস সালামের উপরে, যাবুর নাযিল হয়েছিল দাউদ আলাইহিস সালামের উপরে, ইঞ্জিল নাযিল হয়েছিল ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে। এছাড়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছোট-বড়ো সহীফা নাযিল হয়েছিলো নবী-রসুলদের উপরে।

**اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَي**

এ তো রয়েছে পূর্ববতী সহীফাগুলিতে; ইব্রাহীম ও মূসার সহীফাগুলিতে। সুরাহ আ'লা, আয়াত ১৮-১৯।

সহীফা অর্থ লিখিত পৃষ্ঠাসমূহ, পুস্তিকা বা গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি ইব্রাহিম ও মুসাকেও সহীফা বা গ্রন্থ দান করা হয়েছিল।

কিন্তু পরে ঐ নবী-রসুলদের অনুসারীরা তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, ইচ্ছাকৃত, ভুলে যাওয়া, গোপন করা, হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে বিকৃত করে বলে কুরআন ও হাদিসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন -

**اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ**

হে মুসলমানগণ, তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত; অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল। সুরাহ বাকারাহ, আয়াত ৭৫।

আল্লাহর কিতাব সমূহে বিশ্বাস করার সাধারণ প্রকাশ এই যে, মুমিন সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসুলদের নিকট ওহীর মাধ্যমে কিতাব প্রেরণ করেছেন যেগুলি সন্দেহাতীত ভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য হেদায়েত ও মানবজাতির পথনির্দেশক নূর তবে সেগুলি বিকৃত বা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাই আল্লাহ সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন নাজিল করেছেন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের সত্যতা ঘোষণা করতে, সেগুলির স্থান পূরণ করতে এবং পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে রহিত করতে। এই সর্বশেষ কিতাব কুরআনের মধ্যেই সকল কিতাবের নির্যাস ও মানবজাতির মুক্তির পথ রয়েছে।

তাওরাত যাবুর ইঞ্জিল ও কোরআনসহ নবীদের প্রতি নাযিলকৃত সকল কিতাব ওহী। সবই আল্লাহ তাআলার কালাম তবে কুরআন কারীম ছাড়া অন্য সকল আসমানী কিতাব বিকৃতির শিকার হয়েছে, তাওরাত ও ইনজিলের অনেক অংশ তারা ভুলে অবহেলায় ও ইচ্ছাকৃত বিকৃতি সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিলুপ্ত করেছে আবার কিছু পুস্তক তারা নিজেরা লিখেও চালিয়েছে তবে অন্যান্য গ্রন্থের মত তা একেবারে হারিয়ে যায়নি বিকৃতি সংযোজন বিয়োজন বিলুপ্তি ভুলে যাওয়া গোপন করা ইত্যাদির পরেও আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিস্টানদের নিকট তাওরাত যাবুর ও ইঞ্জিন নামে কিছু কিতাব রয়েছে যেগুলির মধ্যে আল্লাহর বাণী ও মানবীয় বিকৃতি রয়েছে সংমিশ্রিত রয়েছে। এগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী নবীগণের বিষয়ে, তাওহীদ ও রিসালাতের বিষয়ে, শরীয়ত বা ব্যবস্থার বিষয়ে এবং শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন ও তার ওপর বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে অনেক সঠিক শিক্ষা এখনো বিদ্যমান। এসব বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আল্লাহ আহলে কিতাব দেরকে আহবান করেছেন। কখনো কখনো তাদের বিকৃত বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করতে তাদের কিতাব থেকে প্রমাণ পেশ করতে আহ্বান করেছেন। এখন এগুলির মধ্যে ঠিক কোন কথাটি সঠিক ওহী এবং কোন কথাটি বিকৃতি তা বুঝার বা যাচাই করার কোন নিরপেক্ষ উপায় নেই। একমাত্র আল কোরআনই সত্য যাচাইয়ের একমাত্র মাপকাঠি। মহান আল্লাহ বলেন -

**وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ**

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। সুরাহ মায়িদাহ, আয়াত ৪৮।

এভাবে আমরা জানতে পারছি যে কোরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের নিয়ন্ত্রক, পর্যবেক্ষক ও পরীক্ষক এ সকল গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান কোন তথ্য যদি কুরআনের সাক্ষ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে আমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করি আর যে তথ্য কুরআনের সাক্ষ্যে মিথ্যা বলে প্রমাণিত

হয় তাকে আমরা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করি। আর কোরআন যদি সে বিষয়ে নীরব থাকে তবে আমরাও সে বিষয়ে নীরব থাকি কারণ তা সত্ত্বেও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে সহজ মূল নীতি শিখিয়েছেন। ইহুদী-খ্রিস্টানদের কিতাবে যা কিছু রয়েছে তা কোরআনের আলোকে বিচার করা সাধারণভাবে সকলের জন্য হয়তো সহজ নয় কাজেই এ সকল পুস্তকের কিছুই সঠিক বলে গ্রহন করার বা মিথ্যা বলে ঘোষণা দেওয়া যাবে না বরং বলতে হবে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা সঠিক তোমাদের গ্রন্থে কোন কথাটি সঠিক এবং কোনটি বিকৃতি তা তিনিই ভালো জানেন।

# ঈমান বিল কুরআন

মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির পথে আহবানের জন্য আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম যা তিনি তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ করেন। পবিত্র কুরআন আল্লাহর প্রেরিত চূড়ান্ত ও সর্বশেষ গ্রন্থ। কুরআন কারীমই মানবজাতির সকল কল্যাণ, সকল মঙ্গল ও সকল সফলতার উৎস। আল্লাহর এই সর্বশেষ গ্রন্থকে আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা পূর্বের গ্রন্থগুলোকে দেননি। কুরআন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস কেমন হবে তা নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

**১. কুরআন নাযিলকারী স্বয়ং আল্লাহঃ**

আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সু দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নাযিল করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

**تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ**

এ কিতাবের অবতরণ বিশ্বপালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই। সুরাহ সাজদা, আয়াত ২।

**২. কুরআন হেফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহঃ**

আল্লাহ তাআলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি নিজে স্বয়ং কোরআন সংরক্ষণ এবং হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। সেজন্য যুগ যুগ ধরে কুরআনের পাঠ, ভাষা ও অর্থ অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কিয়ামতের আগে আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে তুলে নিবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

**اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ**

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। সুরাহ হিজর, আয়াত ৯।

**৩. কুরআন আল্লাহর কালামঃ**

কোরআন মাজীদ নিছক আল্লাহর কথার মর্ম বাণী নয়। কুরআন মাজীদ বাস্তবেই আল্লাহর বাণী, আল্লাহর কথা, কোন রূপক অর্থে নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ যখন চান তখনই কথা বলেন। আল্লাহ বলেন -

وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسٰي تَكْلِيْمًا

আর আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি। সুরাহ নিসা, আয়াত ১৬৪।

আল্লাহর কালাম কেবলমাত্র লিখিত কোরআন মাজীদ নয় কুরআন ছাড়াও আল্লাহর আরো অনেক কথা আছে যা কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ নয়। আল্লাহ বলেন -

وَلَوْ اَنَّمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللهِ ط
اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর কালিমা লিখে শেষ করা যাবে না। সুরাহ লুকমান, আয়াত ২৭।

**৪.কুরআন আল্লাহর অবিনশ্বর সিফাতঃ**

কুরআন আল্লাহর বাণী। আর আল্লাহর বাণী বা কথা হচ্ছে আল্লাহর সিফাত। আর আমরা জানি আল্লাহর সিফাত অনাদি, অনন্ত, অবিনশ্বর।

**৫. কুরআন মাখলুক বা সৃষ্ট নয়ঃ**

কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কালাম আল্লাহর একটি গুণ। আল্লাহর গুণ আল্লাহর মতই অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহর গুণ কখনোই মাখলুক নয়। কেউ যদি বলে আল্লাহর কুরআন মাখলুক তবে সে কুফরি করলো। তবে কোরআন ছাপানোর কাগজ সৃষ্ট এবং লেখার কালিও সৃষ্ট। তেলাওয়াতকারীর স্বর, দুই ঠোঁট, জিহ্বা, কণ্ঠনালী, বাগযন্ত্রের নড়াচড়া, গহ্বর এবং লালা ইত্যাদি সবই আল্লাহর সৃষ্টি হলেও সেই সৃষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েই উচ্চারিত হয় আল্লাহর কালাম। এ কথা বলার সুযোগ নেই যে কুরআন মাজীদ সৃষ্ট বাগযন্ত্রে উচ্চারিত হয় বলে আল্লাহর কালাম নয়।

**৪. নবী-রসুলগণের উপর বিশ্বাসঃ**

ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে নবী রসূলগণের উপর বিশ্বাস। আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের হেদায়াতের জন্য তাদের মধ্য থেকেই বর্ণিত নবী রাসূল

প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তাআলা রসূল প্রেরণ করেছেন এজন্য যে তারা এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিবেন এবং তাবুত বর্জনের আহ্বান জানাবেন আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। সুরাহ নাহল, আয়াত ৩৬।

নবী রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহর নির্বাচিত বিশেষ বান্দা। তারা সমগ্র মাখলুকের চেয়ে মর্যাদাবান এবং শ্রেষ্ঠ। তারা মানুষ তবে মাটির তৈরি কিন্তু তাদের অন্তর আল্লাহ প্রদত্ত নূরের দ্বারা আলোকিত। তারা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সংযোগকারী। তারা আল্লাহর বাণী মানুষকে পৌছে দিতেন। তারা ছিলেন মানবজাতির কান্ডারী, মানবতার শান্তি ও সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শক। তাদের দান করা হয়েছে অদম্য মনোবল এবং অনন্য গুণাবলী তাই তারা আল্লাহ তাআলার রিসালাতের মহান দায়িত্ব আদায় করতে পেরেছেন। তারা ছিলেন পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। প্রথম নবী হলেন আদম আলাইহিস সালাম, সর্বপ্রথম রসূল নূহ আলাইহিস সালাম আর সর্বশেষ নবী ও রসূল হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী রাসুলের সঠিক সংখ্যা আমরা জানি না কোরআনে শুধুমাত্র ২৫ জন নবী রাসুলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ যে সকল নবীর নাম উল্লেখ করেছেন তাদের প্রতি ঈমান আনতে হবে যেমন মুহাম্মদ ইব্রাহীম মুসা ঈসা এবং নূহ আঃ আর যে সকল নবীর নাম আমরা জানি না তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত বা মৌলিকভাবে ঈমান আনতে হবে। নবী রাসূলগণের প্রতি এ বিশ্বাস রাখা যে তাদের সকলের রিসালাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এবং সত্য। অতএব নবী রসুলদের কাউকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। সবার প্রতি সমানভাবে ঈমান আনতে হবে, কারোর প্রতি ঈমান আনবে আর কারো প্রতি আনবে না এমনটি করা সুযোগ নেই। রাসূলগণের বিশুদ্ধ সংবাদ গুলোকে সত্যায়ন করতে হবে। শরীয়তগুলোর মধ্য হতে বর্তমানে শুধু শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে বহাল আছে এবং পূর্বের নবীদের শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে তাই শরীয়তের ক্ষেত্রে এখন শুধু শরীয়তে মোহাম্মদই মানতে হবে, অন্যথায় নাজাত মিলবে না।

# ইসমাতুল আম্বিয়া

**নবী ও রসুলগণ মা'সুম বা নিষ্পাপ বা ইসমাতুল আম্বিয়াঃ**

ইসমাত (العصمة) শব্দটি আসামা (عصم) পিয়া মন থেকে গৃহীত ক্রিয়ামুল থেকে গৃহীত। যার অর্থ নিষেধ করা সংরক্ষণ করা বা হেফাজত করা। ইসলামী পরিভাষায় ইসমত বলতে বুঝানো হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তিকে বা পাপ বা ভুল-ভ্রান্তি থেকে সংরক্ষণ করা। ইসমাতুল আম্বিয়া অর্থ নবীগণের নিষ্পাপ। এ বিষয়ে ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ বলেন, নবীগণ সকলেই কবিরা গুনাহ, সগিরা গুনাহ, কুপার ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও বিমুক্ত ছিলেন। তবে কখনো কখনো তাদের থেকে সামান্য পদস্কলন ও ভুল ত্রুটি ঘটেছে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সমস্ত নবীগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন, শরীয়তের প্রচারের ক্ষেত্রে তারা ন্যূনতম ত্রুটি ও করেননি, তারা কোন কিছু গোপন রাখেননি। তারা রিসালাতের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে পালন করেছেন মহান আল্লাহ বলেন-

**فَهَلْ عَلَي الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ**

সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া রসূলদের উপর কি কোন দায়িত্ব আছে? সুরাহ নাহল, আয়াত ৩৫।

কোরআন হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে সকল নবী-রসূলই আল্লাহর মনোনীত নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ প্রিয় বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বারবার বলেছেন নবীগণ বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত হিদায়াত ও মনোনয়ন প্রাপ্ত আল্লাহ তাআলা বলেন -

**اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۙ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۙ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا**

এরাই সেই সব নবী যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং তাদেরই উত্তরসুরী যাদেরকে আমি নূহের সাথে (নৌকায়) বহন করেছিলাম। এরা ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর এবং তাদেরই দলভুক্ত যাদেরকে আমি সৎপথ দেখিয়েছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। সুরাহ মারইয়াম, আয়াত ৫৮।

এই অর্থের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায় যে বিশেষভাবে পবিত্র ও নিষ্কলুষ বাছাই করা ব্যক্তিদেরকেই আল্লাহ নবুয়াত প্রদান করেছেন। এছাড়া বারংবার আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন স্থানে নবীগণকে পবিত্র একনিষ্ঠ সব ইত্যাদির বিশেষণের ভূষিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে নবী রাসুলদের ইত্তেবা বা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশক প্রমাণ করে

যে তারা নিষ্পাপ ছিলেন। কোরআন হাদিসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে মুসলিম উম্মার বিশ্বাস এই যে নবীগণ সকলেই আল্লাহর বিশেষ করুণা প্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দা ছিলেন। তারা সবাই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ও নিষ্পাপ ছিলেন, মানবীয় ভুলত্রুটি ছাড়া কোন পাপে তারা লিপ্ত হননি

## খতমে নবুয়াত

তাওহিদ ও আখিরাতের পর ইসলামের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস যে সকল বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি আকীদা হল আকিদায়ে খতমে নবুয়াত অর্থাৎ নবুয়াত ও রিসালাতের পবিত্র ধারা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর আগমনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কেউ তারপরে নবী হবে না কারো উপর ওহে অবতীর্ণ হবে না। এমনকি কারো উপর এমন কোন এলহাম হবে না যা দিনের ব্যাপারে হুজ্জত অর্থাৎ প্রমাণ স্বরূপ। ইসলামের এ আকিকায় খতমে নবুয়াত নামে পরিচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানা থেকে এ পর্যন্ত গোটা মুসলিম উম্মত কোন ধরনের ন্যূনতম বিবাদ ও মতানৈক্য ছাড়াই এই আকীদা কে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মেনে আসছে। কুরআন কারীমের বহু আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসংখ্য হাদিসে এর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে। এই ব্যাপারটি অকট্যভাবে প্রমাণিত ও সর্বজন স্বীকৃত।

কোরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে নিম্নে কিছু প্রমাণ তুলে ধরা হলো আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন -

**مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ**

মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নয় বরং সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। সুরাহ আহযাব, আয়াত ৪০।

অত্র আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিমান হয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে কোন নবী নাই। নবী যখন আসবেন না রাসুল আসার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন - আমার উম্মতের মধ্যে থেকে ৩০ জন মিথ্যাবাদী আসবে, প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমি হলাম শেষ নবী। আমার পরে কোন নবী নেই। ইমাম তিরমিজি হাদিস থেকে হাসান সরি বলেছেন তিরমিজি হাদিস নং ৩৭১০।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেন, মূসা আঃ এর নিকট হারুন আলাইহিস সালাম যেমন, তুমি আমার নিকট ঠিক তেমন তবে আমার পরে আর কোন নবী নেই সহীহ বুখারী হাদিস নং ৪০৬৪।

রাসুল সাঃ বলেন, আমার পরে কেউ নবী হলে ওমর ইবনুল খাত্তাব নবী হতেন। সুনান তিরমিজি হাদিস নং ৩৬১৯

হাদিস সমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আগমনের পর যারা নবুয়তের দাবি করবে তাদের জন্য দাজ্জাল শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হলো চরম ধোঁকাবাজ। এই শব্দ ব্যবহার করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন যে আমার পর যারা নবুওয়াতের দাবি করবে তারা স্পষ্ট ভাষায় ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ না করে কুটকৌশলে কাজ করবে। এই চরম ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য উম্মতের একথা স্মরণ থাকা উচিত যে আমি খাতামুন নাবিয়ীন অর্থাৎ আমার পর কেও নবী হবে না। খতমে নবুয়তের আকিদা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এই আকীদায় বিশ্বাসী হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, অস্বীকারকারী কাফের। বর্তমানে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীরা ফিতনা সৃষ্টি করছে, তারা কাদিয়ানী নামে পরিচিত। তারা খতমে নবুয়তের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের ইমান হরণ করছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হকের উপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থাকার তৌফিক দিন।

**৫. আখিরাতের উপর বিশ্বাসঃ**

ঈমানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে আখিরাতের উপর বিশ্বাস। আখিরাতের কয়েকটি স্তর রয়েছে।

**মৃত্যুঃ** জীবনের মতই মৃত্যু চিরন্তন সত্য। আল্লাহ ছাড়া কেউ চিরঞ্জীব নয়। রবের শাশ্বতা ঘোষণাঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۚ ۖ وَّيَبْقٰي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যারা আছে তাদের প্রত্যেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। থাকবে শুধু তোমার মহামহিম ও চিরসম্মানিত প্রভুর সত্তা। সুরাহ আর রহমান, আয়াত ২৬-২৭।

**বারযাখঃ** মৃত্যু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়কে বলে বারযাখ। বারযাখের প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন -

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰي يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বারযাখ। সুরাহ মুমিনুন, আয়াত **১১০**।

মৃত্যু পরবর্তী যে সমস্ত বিষয়ে ওহীর বর্ণনা আছে সেই সমস্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যেমন কবরের পরীক্ষা, কবরের শাস্তি, পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস ইত্যাদি আল্লাহ বলেন -

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰي رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ

আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে আসবে।

**কিয়ামতঃ** কেয়ামত সুনিশ্চিত বিষয়, কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান ও পূনর্জীবনে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি কাফের। কিয়ামত অস্বীকারকারী ব্যক্তিদের ব্যাপারে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিচ্ছেন -

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا

বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে আর কিয়ামতকে যে অস্বীকার করে তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। সুরাহ ফুরকান, আয়াত **১১**।

**কিয়ামত দিবসে হিসাব ও মিযানঃ** কেয়ামতের দিন আল্লাহ হিসাবের জন্য মিজান বা দাড়িপাল্লা স্থাপন করবেন। যে ব্যক্তি হিসাব ও কর্মের প্রতিদান কে অস্বীকার করে সে মুমিন থাকতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۗ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰي بِنَا حٰسِبِيْنَ ۝

আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কারো কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাযির করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। সুরাহ আম্বিয়া, আয়াত ৪৭।

কাজেই সৎ কর্মের প্রতিদান, মন্দকর্মের শাস্তি ও জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম অনুষঙ্গ।

**জান্নাত নয়তো জাহান্নামঃ** জাহান্নামের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۙ

অতঃপর যারা হয়েছে দুর্ভাগা, তারা থাকবে আগুনে। সেখানে থাকবে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ। সুরাহ হুদ, আয়াত ১০৬।

জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ

আর যারা ভাগ্যবান হয়েছে, তারা জান্নাতে থাকবে। সুরাহ হুদ, আয়াত ১০৮।

আখিরাতের যে সমস্ত বিষয় কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেসব সমস্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ যেমন পুলসিরাত, মিজান, হাউজে কাউসার সওয়াব, আযাব ইত্যাদি।

**৬. তাকদীরের উপর বিশ্বাসঃ**

তাকদীর অর্থ পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা ইত্যাদি। পরিভাষায়- তাকদীর সব কিছুর আগে সে সম্পর্কে আল্লাহর সৌম্যক জ্ঞান, সেগুলি লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধকরণ, তদ্বিষয়ে তার পূর্ণ ইচ্ছার সমন্বয় এবং অবশেষে সেগুলিকে সৃষ্টি করাকে তাকদীর বলে। তাকদিরের উপর বিশ্বাস ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

**তাকদীরের স্তর ৪টিঃ**

চারটি স্তম্ভের উপর তাকদিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই চারটি স্তর সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান রাখা ও বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা আসবে।

**১ম স্তরঃ** সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর চিরন্তন জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে এই মর্মে আমাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। তাকদির একমাত্র আল্লাহর বিষয়। তাকদিরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা একমাত্র তিনিই জানেন। তাকদিরের সময়কাল, পাত্র, সূচনা ও সমাপ্তি একমাত্র তিনি জানেন।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন। জ্ঞানের অধিকারী, পরম দয়াময়, পরম দয়ালু। সুরাহ হাশর, আয়াত ২২।

আল্লাহর ইলম ও তাকদির একটি আরেকটির সাথে জড়িত। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকদিরের ক্ষমতাকে অস্বীকার করলো সে তার ইলমকে অস্বীকার করল আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইলমকে অস্বীকার করল সে তার তাকদিরের ক্ষমতা কে অস্বীকার করল।

**২য় স্তরঃ** আল্লাহ তার চিরন্তন জ্ঞান অনুযায়ী লাওহে মাহফুজে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে তার সবই লিখে রেখেছেন। এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ۚ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرٌ

তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। তা তো একটি কিতাবে (লাওহে মাহ্‌ফূযে) লিখিত আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য সহজ। সুরাহ হাজ্জ, আয়াত ৭০।

নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন - আসমান জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি জীবের তাকদীর সমূহ লিখে রেখেছেন।

**৩য় স্তরঃ** তাকদীরের ৩য় স্তর হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই হয় না একথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। সমস্ত কিছু সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানের নামই তাকদির নয়। তাকদীর আল্লাহর ফয়সালা। আমরা ইচ্ছা করতে পারিনা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া

إِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তাকে শুধু “হও” বলে নির্দেশ দেন, আর অমনি তা হয়ে যায়। সুরাহ ইয়াসিন, আয়াত ৮২।

**৪র্থ স্তরঃ** তাকদিরের চতুর্থ স্তর হচ্ছে সৃষ্টি করা। আল্লাহর রাজ্যের সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন এ কথার প্রতি ঈমান আনা।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَّهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর কর্মবিধায়ক। সুরাহ যুমার, আয়াত ৬২।

অর্থাৎ তিনি কেবল পৃথিবী সৃষ্টি করেননি বরং তিনি এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তার সৃষ্টি করার কারণে অস্তিত্ব লাভ করেছে, তেমনি তার টিকিয়ে রাখার কারণে টিকে আছে, তার প্রতিপালনের কারণে বিকশিত হচ্ছে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কল্যাণে তা কাজ করছে।

# তাকদীর দুই প্রকার

তাকদিরে মুবরাম (চূড়ান্ত তাকদীর)- উম্মুল কিতাবে লিখিত তাকদির এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকারের তাকদিরের কোন পরিবর্তন হয় না।

তাকদিরের মুআল্লাক (ঝুলন্ত তাকদির)- ফেরেশতা মন্ডলীর নিকট লিখিত তাকদীর এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার তাকদিরে পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং রিজিক, আয়ু লাউহে মাহফুজে চূড়ান্ত রয়েছে, তাতে বিন্দুমাত্র কোন পরিবর্তন হয় না তবে ফেরেশতামন্ডলীর দপ্তরে লিখিত রিজিক, আয়ু ইত্যাদিতে পরিবর্তন হতে পারে।

# উপকরণ গ্রহণ তাকদীর বিশ্বাস পরিপন্থী নয়

আল্লাহ যেমন কোন কাজ ও বস্তু সৃষ্টি করেন তেমনি সেসব কাজ ও বস্তুর হেতু ও উপকরণ তিনিই সৃষ্টি করেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কোন উপকরণ বা হেতু ছাড়াই সব সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর মহাপ্রজ্ঞা ও জ্ঞানের দাবি এমন যে, তিনি গোটা বিশ্ব জগতকে কিছু নিয়ম কানুন ও সুন্নাহ-শৃঙ্খলার উপর পরিচালিত করেন।

**তাকবীরে বিশ্বাসের ফলঃ** তাকবীরে বিশ্বাসের দ্বারা বান্দার অন্তর সমস্ত মাখলুক ও উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়। বান্দার অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মে যে সমস্ত কিছু এক আল্লাহর ফয়সালায় হয়ে থাকে। তাকদিরের প্রতি ঈমান যত মজবুত হবে বিপদ-আপদে, কোন কিছু প্রাপ্তি ও প্রাপ্তির জন্য বান্দার হা-হুতাশ, পেরেশানি তত লোপ পাবে, কোন তাকদিরের অন্তরালে নিহিত হিকমাহ বা বাস্তবতা কারো বুঝে আসুক বা না আসুক তাকদীরের কোন বিষয়কে অস্বীকারের সুযোগ নেই, কেননা এমন অনেক কিছু রয়েছে যা আমাদের বিবেক বুদ্ধিতে ধরে না।

# কুফর

**কুফরের পরিচয়ঃ** কুফর অর্থ গোপন করা, অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা। যে সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনা অপরিহার্য সেসব বিষয়ের উপর ঈমান না আনা হচ্ছে কুফর। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

ঈমানের বিষয় যে অবিশ্বাস করে তার কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেল। পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুরাহ মায়িদা, আয়াত ৫।

মুমিন হওয়ার জন্য যেভাবে ইসলামের সব বিধান বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হয় তেমনই ঈমান নষ্ট হবার জন্য ইসলামের সকল বিধানকে অস্বীকার করতে হয় না। অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে কোন একটা বিধানকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করলেই ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং ঈমানের গণ্ডিতে থাকতে হলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইসলামের সকল বিধানকেই বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হবে।

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰي اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

তোমরা কি তাহলে (আল্লাহর) কিতাবের কিছু বিশ্বাস করো আর কিছু অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারা এমন কাজ করে তাদের প্রতিফল অন্য কিছু নয়— পার্থিব জীবনে (বড় রকম) লাঞ্ছনা, আর কেয়ামতের দিন তাদেরকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে কঠোর শাস্তির দিকে। তোমরা যা করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নন। সুরাহ বাকারাহ, আয়াত ৮৫।

## নাওয়াকিদুল ঈমান বা ঈমান ভঙ্গের কারণ

আমরা জানি যে ওযু ভঙ্গের কারণ আছে নামাজ ভঙ্গের কারণ আছে। ওযু করার পর ও নামাজ শুরু করার পর নির্দিষ্ট কিছু কাজ করলে যেমন অজু ভেঙ্গে যায় ও নামাজ নষ্ট হয় ঠিক তেমনি ঈমান আনার পর কিছু বিশ্বাস, কথা ও কাজ করলেও ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়। এগুলোকে নাওয়াকিদুল ঈমান বলে। আমরা ওযু ভঙ্গের কারণ, নামাজ ভঙ্গের কারণ জানলেও ঈমান ভঙ্গের কারণ জানিনা। ফলে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী ও তাহাজ্জুদ আদায়ের দাবিদারের আচার, আচরণ, উচ্চারণেও এমন কিছু প্রকাশ পাচ্ছে যা সর্বসম্মত আকিদা বিরোধী ও সরাসরি ঈমান বিনষ্টাকারী। মুমিন হওয়ার পর ঈমান বিনষ্টকারী কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা ফরজ।

নিম্নে আমরা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

## ঈমান ভঙ্গ হয় বা কুফল প্রকাশ প্রায় তিন মাধ্যমে

১. আকিদা বিশ্বাস ২. কথা ৩. কাজকর্ম। কোন মুসলিম এই তিনটি বিষয়ের যেকোনো একটির মাধ্যমে ঈমান হারিয়ে কাফের হয়ে যায়। মানুষ কখনো এমন বিশ্বাস লালন করে বা এমন কথা মুখ দিয়ে প্রকাশ করে অথবা এমন কাজ করে বসে যা ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তখন সে মুমিন-মুসলিম থাকতে পারে না।

## ঈমান ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ

নীচে ঈমান ভঙ্গ হওয়ার কিছু কারণ এবং রূপ উল্লেখ করা হলোঃ

**১. ইসলাম ত্যাগ করা বা মুরতাদ হওয়াঃ** ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা বা কোন ধর্মই না মানা যেমন খ্রিস্টান বা ঈসায়ী মুসলিম হওয়া, অদৃশ্য বস্তুকে না মানার কথা বলে আল্লাহকে বিশ্বাস না করা এবং প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক হওয়া ইত্যাদি।

**২. শিরক করাঃ** শিরক সাধারণত দুই বিষয়ের মধ্যে হয়ে থাকে -
**ক. শিরক ফিল ইবাদাহ বা উলুহিয়াঃ** তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করে তার ইবাদত করা কিংবা আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করা যেমন আল্লাহ ছাড়া

অন্য কাউকে ইবাদতের সিজদা করা, কারো জন্য নামাজ পড়া, গাইরুল্লাহর নামে মানত করা, সাদাকা দেওয়া, কোরবানি করা ইত্যাদি।

**খ. শিরক ফির রুবুবিয়াঃ** এমন কোন বিশ্বাস পোষন করা বা কাজ করা যা তাওহীদ পরিপন্থী যেমন আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করা আল্লাহ ছাড়া কাউকে রিজিকদাতা, সন্তানদাতা ইত্যাদি মনে করা।

**ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণঃ** কোন পীর, অলি বা মাজারকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বা লাভ ক্ষতির মালিক মনে করে সাহায্য চাওয়া, সন্তান চাওয়া, ধন-সম্পদ চাওয়া, সমস্যার সমাধান চাওয়া। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ

“আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না যা তোমার কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে না। যদি করো তাহলে অবশ্যই তুমি জালেমদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।” সুরাহ ইউনুস, আয়াত ১০৬।

**ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণঃ** ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলো কোন একটিতে সন্দেহ বা সংশয় পোষণ করা বা অজ্ঞেয়বাদী হওয়া, কেননা সংশয়-সন্দেহ ও ঈমান একসাথে হতে পারে না বরং এটা মুনাফিকের কাজ। আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি রহিমাহুল্লাহ বলেন, জেনে রেখো জরুরীয়াতে দ্বিন বা দ্বিনের সর্বজনগৃহীত বিধানের ক্ষেত্রে দ্বিধা গ্রস্থ হওয়া তা অস্বীকারের মত।

**ঈমান ভঙ্গের পঞ্চম কারণঃ**

**কুফর করা।** যেমনঃ অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইসলামের বিষয়গুলো যেকোনো একটি কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা, ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, ইসলামের শিয়ার বা প্রতীকসমূহের অবমাননা করা, ইসলামের মৌলিক শিয়ার হলো কোরআন মাজীদ, বিভিন্ন ইবাদত যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, আজান, দোয়া-দরুদ, বিভিন্ন ফজিলতপূর্ণ স্থান যেমন কাবা শরীফ, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা ও পৃথিবীর সকল মসজিদ ইত্যাদি এগুলোর অবমাননা যেমন কোরআন মাজীদকে ছুঁড়ে ফেলা, মসজিদকে গোয়ালঘর বলা ইত্যাদি।

**ঈমান ভঙ্গের ষষ্ঠ কারণঃ**

**আল্লাহ ও রাসূলের অবমাননা বা কটুক্তি করা** যেমন নবীজিকে যুদ্ধবাজ বা নারীলোভী বলা, অবমাননার উদ্দেশ্যে তার ছবি আঁকা বা নামের অবমাননা করা ইত্যাদি। ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহিঃ বলেন, কেউ যদি আল্লাহ তাআলা বা তার রসুলকে গালিগালাজ করে অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত কোন বিষয় প্রত্যাখ্যান করে কিংবা কোন নবীকে হত্যা করে তাহলে সে মুসলমানদের নিকট সর্বসম্মতভাবে কাফের যদিও সে আল্লাহর নাযিলকৃত প্রতিটি বিষয়ের স্বীকারোক্তির প্রদান করে।

**ঈমান ভঙ্গের সপ্তম কারণঃ**

**ইসলামের অকাট্য কোন বিধানের উপর আপত্তি তোলা বা যুগের সাথে অনুপযোগী মনে করা কিংবা সংস্কার যজ্ঞ বলে মনে করা।** ইসলামের বিধানাবলীর প্রতি ঈমান আনার অনিবার্য অর্থ হচ্ছে মুসলিম হওয়া তথা নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। আল্লাহর প্রতি ঈমান আর আল্লাহর বিধানে আপত্তি একত্র হতে পারে না। রাসুলের প্রতি ঈমান আর তার আদর্শের উপর আপত্তি, কুরআনের প্রতি ঈমান আর তার কোন আয়াত বা বিধানের উপর আপত্তি কখনো একত্রিত হতে পারেনা।

**ঈমান ভঙ্গের অষ্টম কারণঃ**

**সুনিশ্চিত প্রমাণিত ইসলামের কোন বিধান বা রাসুলের সুন্নাহকে শরীয়তের বিধান হিসেবে অপছন্দ করা।**

উল্লেখ্য- দ্বিনের কোন বিষয়কে শরীয়তের বিধান হিসেবে অপছন্দ করে না বরং অপছন্দ করে স্বভাবগত কারণে বা ঝামেলা, বিরক্তি, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদির কারণে যেমন ঠান্ডা পানির কারণে শীতের রাতে ওযু করতে অপছন্দ করা, ভালোবাসা কমে যাবে বলে স্বামীর একাধিক বিবাহ অপছন্দ করা তাহলে ঈমান ভঙ্গ হবে না।

**ঈমান ভঙ্গের নবম কারণঃ**

**অকাট্যভাবে প্রমাণিত কিছু বিধান মানা আর কিছু না মানা।** অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোর কিছু মানা আর কিছু না মানা কুফর। এগুলোর কিছু মেনে আর কিছু না মেনে কুফর ও ঈমানের মাঝামাঝি কোন পথ অবলম্বন করার সুযোগ নেই। তাদের সেই মাঝামাঝি পন্থা হলো আল্লাহকে বিশ্বাস করা কিন্তু রসূলকে অবিশ্বাস করা অথবা রাসূলদের কাউকে মান্য করা আর কাউকে অমান্য করা। প্রচলিত কিছু মাঝামাঝি পন্থা হলো কোরআন মানা কিন্তু হাদিস না মানা তদ্রুপ শরীয়তের এক বিধান মানা ও অন্যান্য বিধান অমান্য করা ইত্যাদি। সুতরাং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী পন্থা বলতে কিছু নাই, হয় ঈমান নয় কুফর।

**ঈমান ভঙ্গের দশম কারণঃ**

**অকট্যভাবে প্রমাণিত কোন হারামকে হারাম মনে না করা অথবা বৈধ মনে করা অথবা হালালকে হারাম মনে করা।** যেমন সুদ, ঘুষ, জুলুম, দুর্নীতি, মদ, মাদকদ্রব্য, গান, বাদ্য, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, লিভ-টুগেদার, সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও প্রাণী বা মানব ভাস্কর্য তৈরি ইত্যাদিকে হারাম জানা সত্ত্বেও হালাল বা বৈধ মনে করা বা পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ হারাম মনে করা। কারণ কোন বস্তু হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা।

**ঈমান ভঙ্গের ১১তম কারণঃ**

**ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম, মতবাদকে সত্য, সঠিক মনে করা বা পরকালে মুক্তি পাবে বলে বিশ্বাস করা অথবা ইসলামের চেয়ে অন্য কোন জীবনব্যবস্থা ও সংবিধানকে উত্তম বা সমতুল্য মনে করা বা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর মনে করা এবং ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা বিশ্বাস না করা।** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম চাইলে তার থেকে সেটা কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুরাহ আলি ইমরান, আয়াত ৮৫।

**ঈমান ভঙ্গের ১২ তম কারণঃ**

**সুনিশ্চিত কাফেরকে কাফের মনে না করা বা কুফরের উপর সন্তুষ্ট হওয়া।** ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যেমন হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান বা মুসলিম নামধারী সুনিশ্চিত কাফের যেমন কাদিয়ানী, হিজবুত তাওহীদ ইত্যাদি দলের বিশ্বাস জানার পরও কাফের মনে না করলে নিজের ঈমান চলে যাবে, কাফের হয়ে যাবে। কেননা ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম। এই বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি ইসলামের বিপরীত শিরক, কুফর মিশ্রিত সব ধর্ম, মতবাদ ও আদর্শকে অস্বীকার করে মুমিন হতে হয়। আজকাল আমাদের দেশে বহুল আলোচিত একটি স্লোগান হলো ধর্ম যার যার উৎসব সবার। এই শ্লোগানের আড়ালে নামধারী মুসলিমরা অন্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এটি ঈমানভঙ্গের একটি কারণ। বর্তমানে প্রচলিত আরেকটি ঈমান বিধ্বংসী চক্রান্ত হচ্ছে ইন্টার পেইথ বা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সংহতি এবং সম্পর্ক। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল ধর্মকে এক করে ফেলা এবং অন্য ধর্মের প্রতি মানুষের যে ঘৃণা সেটা মুছে ফেলা। অথচ আল্লাহর কাছে ইসলাম ছাড়া আর কোন কিছু গ্রহণযোগ্য নয়।

**ঈমান ভঙ্গের ১৩ তম কারণঃ**

**ইবাদতের ক্ষেত্রে বা আকীদার ক্ষেত্রে বিধর্মীদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণ করা।** কথা ও কাজে তাদের ধর্মীয় প্রতীক ও সংস্কৃতির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

**ঈমান ভঙ্গের চৌদ্দতম কারণঃ**

**কুরআনকে বিকৃত বা অরক্ষিত মনে করা পুরো কোরআন হোক বা আংশিক হোক।** অথচ কুরআন মাজীদ হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এর ভিতর কোনো রদবদলের সম্ভাবনা নেই। তাই যে সকল শিয়া সম্প্রদায় বা অন্য যারা কোরআন বিকৃত বা অরক্ষিত বিশ্বাস করে তারা কাফের।

**ঈমান ভঙ্গের পনেরতম কারণঃ**

**শুধু কুরআন মানা, হাদিস-সুন্নাহ তথা নবীজির বক্তব্য কর্ম ও সমর্থন না মানা**। হাদিস অস্বীকারের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কেউ হাদিস বা সুন্নাহকে শরীয়তের উৎস হিসেবেই মানেনা আর কেউ হাদিস মানে কিন্তু যেসব হাদিস শুধু কোরআনের সাথে মিলে শুধু সেসব হাদিস মানে আবার কেউ হাদীসকে ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসেবে মানে কিন্তু বিধান হিসেবে মানে না। আবার কেউ হাদিস কে দলিল হিসেবে মানে কিন্তু কোনটা প্রমাণিত, কোনটা অপ্রমাণিত এতে মুহাদ্দিস এবং মুজতাহিদের সর্বসম্মত উসুল অনুসরণ না করে নিজের বিবেক, বিজ্ঞান বা সামাজিকতার সাথে সাংঘর্ষিক হলে মানে না। আবার কেউ মুতাওয়াতির হাদিস ছাড়া মানে না কারণ খবরে ওয়াহেদ যন্নি অর্থাৎ ধারণা মাত্র। ফতোয়ার কিতাবসমূহে এসেছে কেউ যদি মুতাওয়াতির হাদিস অস্বীকার করে সে নিঃসন্দেহে কাফের আর যে মাশহুর হাদিস অস্বীকার করে সে পথভ্রষ্ট আর খবরে ওয়াহিদ অস্বীকারকারী গুনাহগার।

**ঈমান ভঙ্গের ১৬তম কারণঃ**

**সশস্ত্র জিহাদের বিধান অস্বীকার করা**। কেউ সশস্ত্র জিহাদের বিধান অস্বীকার করলে বা রসুলের যুগে জিহাদ থাকলেও এখন আর জিহাদের বিধান নেই মনে করা বা কুরআন-হাদিসের বর্ণিত জিহাদকে জঙ্গিবাদ, বর্বরতা, মারামারি, উগ্রতা ও সন্ত্রাস ইত্যাদি বলা। বলা বাহুল্য জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে হত্যা করা বা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয় বরং সন্ত্রাস দমন করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আইন-কানুন মেনে নিতে বাধ্য করা।

**ঈমান ভঙ্গের ১৭ তম কারণঃ**

**ইসলামী দন্ডবিধি অস্বীকার করা** ইসলামের দন্ডবিধি অস্বীকার করা, বর্বরতা বলা। ইসলামী আইন হলো আল্লাহর বিধান। এর কোন বিধান পুরাতন বা বর্তমান যুগে অচল হয়ে গেছে মনে করা এতে ঈমান চলে যায়।

**ঈমান ভঙ্গের ১৮তম কারণঃ**

**আল্লাহ তাআলাকে দেহ ও শরীর বিশিষ্ট বা মাখলুকের মত দেহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আকার আকৃতি বিশিষ্ট মনে করা।**

**ঈমান ভঙ্গের উনিশতম কারণঃ**

**আল্লাহর কোন গুণাবলীর অস্বীকার ও অপব্যাখ্যা করা।** আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে। এইগুলোর কোন একটা অস্বীকার করা বা কোন কার্যাবলী অস্বীকার করা বা এগুলো অপব্যাখ্যা করা। আল্লাহর কোন সিফাত বা নাম যেমন অস্বীকার করার সুযোগ নাই তেমনি তার কোন গুণবাচক নামের অপব্যখ্যা করলেও ঈমান হারা হয়ে যাবে।

**ঈমান ভঙ্গের ২০তম কারণঃ**

**আল্লাহর আইন অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভেবে মানব রচিত আইন দিয়ে বিচার করা।** আরো ধারণা করা যে এ যুগে ইসলামী আইন কানুন আর চলবে না কারন এই আইন অনেক পুরাতন হয়ে গেছে অথবা আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনকে জায়েজ মনে করা বা আল্লাহর আইনের উপর মানুষের তৈরি আইনকে প্রাধান্য দেওয়া ঈমান ভঙ্গের একটি বড় কারণ।

**ঈমান ভঙ্গের ২১তম কারণঃ**

**ইসলামের বিচারে সন্তুষ্ট না হওয়া।** ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বিচার করলে সেই বিচারে অন্তরে সংকোচবোধ করা ও কষ্ট পাওয়া বরং ইসলাম বহির্ভূত আইনের কাছে বিচার প্রার্থী হতে স্বস্তি বোধ করা।

**ঈমান ভঙ্গের ২২ তম কারণঃ**

**আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ধরনের আইন তৈরি করা** এজন্য কোন মানুষকে ক্ষমতা প্রদান করা বা তার সমর্থন করা অথবা ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ধরনের কোন আইনকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া।

**উপসংহারঃ** মুসলিম হিসেবে আমাদের কাছে সবচেয়ে দামি জিনিস হচ্ছে ঈমান কিন্তু আমাদের সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত জিনিস হচ্ছে এই ঈমান। আমরা সবাই জানি দুনিয়া ও আখিরাতের মূল চাবিকাঠি হল ঈমান। উভয় জাহানের সফলতা ঈমানের উপরে নির্ভর করে। তাই ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান অন্বেষণ করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এটা ফরজ। তাই আইওএম এর থিসিসের বিষয় হিসেবে **'ঈমান সবার আগে'**

বিষয়টি পছন্দ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে থিসিসের কাজ সম্পন্ন করতে পেরে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। এর মধ্যে যা উত্তম তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার রহমত আর যা কিছু ভুল তা একান্তই আমার। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিক।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বিশুদ্ধ ঈমানসহ দ্বীন মেনে চলার তাওফীক দিক এবং ঈমান-বিধ্বংসী আকীদা, মতাদর্শ থেকে হেফাজত করুক। আমীন।

**সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ**


১. ঈমান সবার আগেঃ মাওলানা আবদুল মালেক হাফিঃ

২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমান-আকীদা - মাওলানা সাঈদ আহমদ হাফিঃ

৩. বুনিয়াদি আকাইদ - মাওলানা বেলাল বিন আলী হাফিঃ

৪. ইমাম আজমের আকিদা - মাওলানা মীযান হারুন হাফিঃ

৫. ইসলামী আকীদা - আইওএম

৬. আমি ঈমান এনেছি - মাওলানা হাফিয আল মুনাদী হাফিঃ

৭. নির্বাচিত প্রবন্ধ - মাওলানা আবদুল মালেক হাফিঃ

৮. ইসলামী জীবনব্যবস্থা - মুফতি তারেকুজ্জামান হাফিঃ

৯. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা - ডঃ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিঃ